সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৪১-৪২
০৩ আগস্ট ২০২৬, সোমবার

ইবরাহীম আল-ইবরাহীম মসজিদ, জিব্রাল্টা

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/ محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ

বার্ষিক : ৭০০ টাকা

ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক** সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

৪১-৪২ সংখ্যা
০৩ আগস্ট-২০২৬ ঈসায়ী
১৯ শ্রবাণ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৯ সফর-১৪৪৮ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সূচিপত্র

মণির খনি– জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের অপরিহার্যতা ০২
সম্পাদকীয়– খাদ্যে ভেজাল: মুনাফার মোহে মানবতার অবমাননা ০৩
দারসুল কুরআন– ঈমান ও 'আমলের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান জান্নাতে চিরস্থায়ী বাসস্থান
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
দারসুল হাদীস– আনুগত্যের সীমারেখা
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
ইসলামী প্রবন্ধঃ ইসলামে কন্যা সন্তান লালনপালনের মর্যাদা
মূল: শাইক মানছুর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আছ ছক'উব
অনুবাদ: শাইখ মুফতি মো. আব্দুর রউফ মাদানী- ১১
ওযূ ও আধুনিক বিজ্ঞান মো. মতিউর রহমান- ১২
শিক্ষা ও সভ্যতা– ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৪
আলোকিত জীবন: বাংলার নবজাগরণের বীর মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ১৬
ক্বাসাসুল কুরআন: মৃতকে জীবিত করার ঘটনা
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ১৯
অভিমত: রাগের ক্ষতি, রাগ নিয়ন্ত্রণের সুফল ও উপায়সমূহ
হোসাইন মঈন- ২০
আন্তর্জাতিক: ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি
সংকলনে– মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা- ২৫
শুব্বান পাতা: জাগ্রত যুবসমাজ ইমরান বিন শামসুদ্দিন- ২৭
স্মৃতির আঙিনায় প্রিয় বন্ধু ফারুক আহমদ (রহিমাহুল্লাহ)
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম- ২৯
মহিলা জগত: কুরআন হাদীসের আলোকে নারীদের মসজিদে সালাত আদায়ের বিধান আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমাদ- ৩১
গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান: জবাব সুপ্ত রায়হান সজিব- ৩৩
কবিতা ৩৬
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৮
প্রচ্ছদ পরিচিতি– ইব্রাহীম আল-ইব্রাহীম মসজিদ
আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৭

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি– জামা‘আতবদ্ধ জীবন-যাপনের অপরিহার্যতা

অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী

۞ ﴿وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا﴾

“আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” *(সূরা আ-লি-‘ইমরান: ১০৩)*

۞ ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

“আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর এরাই সফলকাম।” *(সূরা আ-লি-‘ইমরান: ১০৪)*

۞ ﴿وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

“আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা না হলে তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলীন হয়ে যাবে। আর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।” *(সূরা আল-আনফাল: ৪৬)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

۞ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ.

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “তোমরা জামা‘আত (ঐক্য) অবলম্বন করো এবং বিচ্ছিনতা থেকে সতর্ক থাকো। কারণ শয়তান একাকী ব্যক্তির সঙ্গে থাকে, আর দু’জন (ঐক্য) থেকে সে অনেক দূরে অবস্থান করে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান কামনা করে, সে যেন জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরে। আর যার নেক কাজ তাকে আনন্দ দেয় এবং গুনাহ তাকে কষ্ট দেয়, সেই-ই প্রকৃত মু’মিন।” *(জামি‘ আত-তিরমিযী- হা. ২১৬৫; ইবনু মাজাহ্- হা. ২৩৬৩)*

۞ عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ (رضي الله عنه) وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: الْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

হারিস আল-আশ‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি, যেগুলোর আদেশ আল্লাহ তা‘আলা আমাকে দিয়েছেন– (১) জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরা, (২) (নেতার আদেশ) শোনা, (৩) আনুগত্য করা, (৪) হিজরত করা এবং (৫) মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।

۞ ... مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، ... وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ.

... যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সে তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলেছে, যদি না সে পুনরায় ফিরে আসে।... (তিনি ﷺ বললেন), “যদিও সে সলাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে।

(জামি‘ আত-তিরমিযী- হা. ২৮৬৩; মুসনাদ-ই-আহমাদ)

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে মহান আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে নেতার আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে নেতার অবাধ্য হলো, সে আমার অবাধ্য হলো।” *(বুখারী- ৭১৩৭; মুসলিম- হা. ১৮৩৫)*

মানুষ যখন ফিতনার যুগে উপনীত হবে- এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ হলো–

۞ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ.

“তুমি মুসলিমদের জামা‘আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে।” *(বুখারী- হা. ৭০৮৪; মুসলিম- হা. ১৮৪৭)*

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন (আসার):

۞ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ.

“জামা‘আত (ঐক্যবদ্ধ সমাজ) ছাড়া ইসলাম পূর্ণতা পায় না। আর আমীর (নেতৃত্ব) ছাড়া জামা‘আত প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর আনুগত্য ছাড়া আমীরত্ব (নেতৃত্ব) টিকে না।”

(সুনান আদ-দারেমী)

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

۞ اَلِاجْتِمَاعُ وَالِائْتِلَافُ مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ الدِّينِ، وَالْفُرْقَةُ وَالِاخْتِلَافُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ.

“ঐক্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি দ্বীনের সর্ববৃহৎ মূলনীতিগুলোর একটি। আর বিচ্ছিনতা ও মতভেদ ফিতনার সর্ববৃহৎ কারণগুলোর একটি।” *(মাজমু‘ আল ফাতাওয়া)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

খাদ্যে ভেজাল: মুনাফার মোহে মানবতার অবমাননা

খাদ্য মানুষের জীবন রক্ষা করে; আর হালাল ও পবিত্র খাদ্য রক্ষা করে সভ্যতা। আল্লাহ তা'আলা খাদ্যের মধ্যে বারাকাহ দান করেছেন, যা মানুষের জন্য রহমত ও নিয়ামত। সেই খাদ্যই যখন লোভাতুরের বিষে কলুষিত হয়, তখন শুধু মানুষের শরীর নয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে সমাজের বিবেকও। খাদ্যে ভেজাল তাই নিছক একটি অর্থনৈতিক অপরাধ নয়; এটি আমানতের খিয়ানত, মানবতার প্রতি নির্মম প্রতারণা এবং স্রষ্টার বিধানের সুস্পষ্ট অবমাননা।

পবিত্র কুরআন *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৬৮)* মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে, "হে মানুষ! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো।" আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যবসায়িক সততার এমন এক চিরন্তন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক- "যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" এই ঘোষণার পরও যদি কেউ মানুষের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়, তবে সে শুধু আইনভঙ্গকারী নয়; সে নিজের ঈমান, বিবেক ও মানবিকতার সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আজ আমাদের বাজারের চিত্র উদ্বেগজনক। অধিক উৎপাদনের আশায় মাছ ও গবাদিপশুকে অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক ও ওষুধ প্রয়োগ, ফলমূল ও শাকসবজি দীর্ঘদিন সতেজ রাখতে ক্ষতিকর পদার্থের ব্যবহার, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যে ভেজাল, মসলা ও মিষ্টান্নে কৃত্রিম রং এসব অভিযোগ নতুন নয়। উদ্বেগ আরো গভীর হয়, যখন শিশুদের জন্য তৈরি রঙিন চকলেট, ললিপপ, ক্যান্ডি কিংবা নানা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। যেসব পণ্য শিশুদের আনন্দের প্রতীক হওয়ার কথা, সেগুলোর কোনো কোনোটি যদি তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে তা একটি জাতির ভবিষ্যৎ নিয়েই খেলা করার শামিল।

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এসব পণ্য শুধু অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজারেই নয়, অনেক সময় বড় বিপণিবিতান, সুপার শপ কিংবা ফার্মেসিতেও বিক্রি হতে দেখা যায়। কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ পরীক্ষাগার-প্রমাণ ছাড়া অভিযুক্ত করা ন্যায়সংগত নয়; কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভোক্তার আস্থা রক্ষায় নিয়মিত নমুনা পরীক্ষা, ফলাফল প্রকাশ এবং কঠোর নজরদারির দৃশ্যমানতা এখনো প্রত্যাশার তুলনায় নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআই ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে; মান লঙ্ঘনের অভিযোগে পণ্য প্রত্যাহার ও জরিমানার ঘটনাও ঘটছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন অভিযান তখনই কার্যকর হবে, যখন তার সঙ্গে যুক্ত হবে ধারাবাহিক তদারকি, স্বচ্ছতা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

মনে রাখতে হবে, খাদ্যে ভেজাল শুধু স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে না; এটি সমাজে বিশ্বাসের ভিত্তিও ক্ষয় করে। যে ব্যবসায়ী সামান্য মুনাফার জন্য মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেন, তিনি প্রকৃত অর্থে নিজের উপার্জনের বরকতও নষ্ট করেন। ইসলাম ব্যবসাকে 'ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে; কিন্তু সেই 'ইবাদতের শর্ত হলো সততা, আমানতদারি ও আল্লাহভীতি। নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন বাণিজ্য শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র- সবার জন্যই অকল্যাণ ডেকে আনে।

অতএব, প্রয়োজন কেবল ভ্রাম্যমাণ আদালত নয়; প্রয়োজন বিবেকের আদালতও জাগ্রত হওয়া। রাষ্ট্রকে আইনের কঠোর প্রয়োগ, আধুনিক পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও গণমাধ্যমকে সততা ও হালাল উপার্জনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

একটি জাতির ভবিষ্যৎ তার অন্নের পবিত্রতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে সমাজ তার খাদ্যকে নিরাপদ রাখতে পারে না, সে সমাজ সুস্থ প্রজন্মও গড়ে তুলতে পারে না। তাই খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেবল প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়; এটি ঈমানের দাবি, নৈতিকতার আহ্বান এবং মানবতার প্রতি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার।

درس القرآن / দারসুল কুরআন:

ঈমান ও ‘আমলের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান জান্নাতে চিরস্থায়ী বাসস্থান

আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ٭ۙ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যখনই (জান্নাতে) তাদেরকে ফল-মূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে (পৃথিবীতে) জীবিকা হিসেবে যা দেওয়া হয়েছিল এতো তাই। আর একই রকমের (সাদৃশ্যপূর্ণ) ফল-মূলই তাদেরকে দেওয়া হবে এবং সেখানে থাকবে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী। আর সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।”[১]

শাব্দিক অনুবাদ

وَبَشِّرِ অর্থ- আর আপনি সুসংবাদ দিন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا -যারা ঈমান এনেছে, وَعَمِلُوْا -এবং তারা ‘আমল বা কাজ করেছে, الصَّالِحَاتِ -সৎকাজসমূহ, أَنَّ لَهُمْ-নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে, جَنَّاتٍ -জান্নাত / উদ্যানসমূহ, تَجْرِيْ -প্রবাহিত হয়, مِنْ تَحْتِهَا -তার তলদেশ দিয়ে, الْأَنْهَارُ -নদীসমূহ, كُلَّمَا رُزِقُوْا -যখনই তাদের রিয্ক দেওয়া হবে, مِنْ ثَمَرَةٍ -ফলমূল হতে, قَالُوْا -তারা বলবে, هٰذَا الَّذِيْ -এটি তো সেই জিনিস যা, رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ -আমাদের পূর্বে রিয্ক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, وَأُتُوْا بِهٖ -আর তাদের তা দেওয়া হবে, مُتَشَابِهًا -সাদৃশ্যপূর্ণ করে, وَلَهُمْ فِيْهَا -এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে, أَزْوَاجٌ -জোড়াসমূহ (স্বামী/স্ত্রী), مُطَهَّرَةٌ -পুত-পবিত্র, وَهُمْ فِيْهَا -এবং তারা তার মধ্যে, خَالِدُوْنَ -চিরকাল থাকবে।

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে উল্লেখিত আয়াতটি কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় সূরা, সূরা আল-বাক্বারাহ্ হতে নেওয়া হয়েছে। এটি এ সূরার ২৫ নং আয়াত।

শানে নুযুল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট

এ আয়াতটির শানে নুযুল বা অবতরণের তেমন বিশেষ কোনো কারণ নেই, তবে মক্কা থেকে হিজরত করে আসা মুহাজির এবং মদীনার আনসার মুসলমানরা যখন একটি নতুন সমাজ গঠন করছিলেন তখন তারা কাফিরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ, অভাব-অনটন এবং নানা মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই কঠিন সময়ে মু’মিনদের মনকে শান্ত করতে, সান্ত্বনা দিতে এবং ঈমানের ওপর অবিচল থাকার শক্তি যোগাতে আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতে অবতীর্ণ করে জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দেন।

আলোচ্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত লাভের জন্য ‘খাঁটি ঈমান’ এবং বাস্তব জীবনে ‘নেক ‘আমল বা সৎকাজ’ করার অলঙ্ঘনীয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন এবং এর চূড়ান্ত প্রতিদান হিসেবে ঘন উদ্যান ও প্রাসাদের তলদেশ দিয়ে চিরপ্রবাহিনী নদীসমূহের মনোরম চিত্র তুলে ধরেছেন। একইসাথে আয়াতে জান্নাতী ফলমূলের অনন্য অলৌকিকত্ব প্রকাশ করা হয়েছে, যা দেখতে দুনিয়ার ফলের মতো সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও প্রতি কামড়ে সম্পূর্ণ নতুন ও অতুলনীয় স্বাদের অনুভূতি দেবে এবং জান্নাতবাসীদের উপহার হিসেবে দেওয়া হবে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিমুক্ত পুত-পবিত্র জীবনসঙ্গী। সর্বোপরি, এই বিলাসবহুল জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এর অবিনশ্বরতা ও চিরস্থায়িত্বকে, যেখানে কোনো বার্ধক্য, দুঃখ বা মৃত্যুর ভয় থাকবে না এবং মু’মিনরা সেখানে অনন্তকাল পরম শান্তিতে বসবাস করবে।

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা‘আলা পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে কাফির ও ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মু’মিন ও সৎ লোকদের প্রতিদান ও সম্মানের বর্ণনা

** এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

[১] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২৫।

দিচ্ছেন। কুরআনকে مثاني (মাসানী) নামকরণের এটাও একটি উল্লেখযোগ্য মত যে, এতে প্রত্যেক বিষয় জোড়া জোড়া উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কুফ্‌রের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। মু'মিনদের ভালো পরিণামের সাথে সাথে কাফির মুশরিকদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন।[২]

আবার কুরআনের প্রত্যেক স্থানে ঈমানের সাথে নেক 'আমলের কথা উল্লেখ করে এ কথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, ঈমান এবং নেক 'আমল পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেক 'আমল ব্যতীত ঈমান ফলপ্রসূ নয় এবং ঈমান ব্যতীত নেক 'আমলের কোনো গুরুত্ব মহান আল্লাহর নিকটে নেই। আর 'আমল তখনই নেক 'আমল বলে গণ্য হবে যখন তা সুন্নাত মোতাবেক হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে করা হবে। সুন্নাত পরিপন্থী 'আমল গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ খ্যাতি লাভ ও লোক দেখানোর জন্য কৃত 'আমলও প্রত্যাখ্যাত। তাই যারা ঈমানের সাথে সুন্নাত মোতাবেক 'আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। অত্র নদীসমূহের প্রকার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾

"যার মধ্যে বহমান থাকবে পরিস্কার পানির নহর, এমন দুধের নহর যার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হয় না, এমন শরাবের নহর যারা পান করে তাদের জন্য সুস্বাদু এবং এমন মধুর নহর যা খাঁটি ও স্বচ্ছ।"[৩]

জান্নাতের তলদেশে প্রবাহমান নদী-নালা: জান্নাতের তলদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বৃক্ষরাজী ও অট্টালিকার নিম্নদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়া।[৪]

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জান্নাতের নদী-নালাসমূহ মিশকের পাহাড় থেকে নির্গত।[৫]

এই নদীগুলোর জন্য দুনিয়ার মতো কোনো গর্ত বা পাড় তৈরি করতে হয়নি; বরং এগুলো জান্নাতের ভূমির উপর দিয়েই স্বাচ্ছন্দ্যে প্রবাহিত হবে এবং মু'মিনরা যেখানে চাইবে, নদীগুলো সেদিকেই মোড় নেবে। একটি হাদীসে এসেছে, "হাওজে কাউসার"-এর দু'ধারে খাঁটি মুক্তার গম্বুজ থাকবে। তার মাটি হবে খাঁটি মৃগনাভী, তার নুড়ি পাথরগুলো হবে মণি-মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথর।[৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا﴾

"যখনই তা হতে তাদেরকে রিয্‌ক হিসেবে ফলমূলসমূহ প্রদান করা হবে।"

অর্থাৎ- যখনই জান্নাতিদেরকে জান্নাত হতে জীবিকাস্বরূপ ফলমূল প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে- এটা তো ইতোপূর্বে আমাদেরকে দুনিয়াতেও দেয়া হয়েছে।

مُتَشَٰبِهًا (মুতাশাবিহা) তথা সাদৃশ্যতার রহস্য: জান্নাতের ফলের সাথে দুনিয়ার ফলের কোনো তুলনাই নেই। জান্নাতের নিয়ামতের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে-

"(এমন নিয়ামত) যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তার সঠিক ধারণা উদয় হয়নি।"[৭]

তাহলে এখানে যে বলা হলো জান্নাতীরা তখন বলবে- "এটা তো ইতোপূর্বে আমাদেরকে দুনিয়াতেও দেয়া হয়েছে" -এর অর্থ কী?

এর দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা-

এক. ফলগুলো দেখতে দুনিয়ার ফলের মতো (যেমন- আনার, আঙ্গুর, কলা, খেজুর ইত্যাদি) মনে হবে, যাতে তারা এগুলোকে অপরিচিত বোধ না করে। কিন্তু মুখে দেওয়ার পর দেখা যাবে এর স্বাদ ও সুগন্ধ দুনিয়ার ফলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ উত্তম।

দুই. জান্নাতে যখন একই ফল বারবার দেওয়া হবে, তখন তা দেখতে পূর্বেরগুলোর মতোই মনে হবে, কিন্তু প্রতিবার খাওয়ার সময় সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন এক অতুলনীয় স্বাদ লাভ করবে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: জান্নাতে যা কিছু আছে তা দুনিয়ার সাথে কেবল নামে সদৃশ। ইমাম আওযায়ী (রহিমাহুল্লাহ) ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর থেকে বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীর কাছে এক পেয়ালা ভর্তি সরবত নিয়ে আসা হবে, সে তা খাবে। আরেক পেয়ালা ভর্তি নিয়ে আসা হলে সে বলবে এটা তো এখন মাত্র পান করলাম। ফেরেশ্‌তারা বলবে, পান করতে থাকুন। কেননা এর রং অভিন্ন এবং স্বাদ ভিন্ন। তিনি আরো বলেন- জান্নাতের ঘাস হবে জাফরান,

[২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ১/১৬১।*
[৩] *সূরা মুহাম্মদ: ১৫।*
[৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৫] *সহীহ ইবনু হিব্বান- ৭৪০৮।*
[৬] *সহীহ বুখারী- হা. ৪৯৬৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬২, ৪০০।*
[৭] *সহীহ বুখারী; তাফসীর সূরা আলিফ-লাম-মীম/আস্-সাজদাহ্।*

আর পাহাড়গুলো হবে মেশকে আম্বার। ছোট ছোট সুন্দর বালক ফলমূল নিয়ে জান্নাতিদের কাছে আসবে আর তারা তাদের নিকট থেকে ফলমূল গ্রহণ করবে।

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (আযওয়াজুম মুতাহারাহ্) অর্থাৎ- পবিত্র সঙ্গিনী: "সেখানে তাদের জন্য থাকবে পুতঃপবিত্র সঙ্গিনী" জান্নাতীগণ জান্নাতে যা কিছু পাবে তার মধ্যে অন্যতম হলো পবিত্র সঙ্গিনী। মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর একবচন হলো- 'যাওজ' অর্থ- জোড়া। এ শব্দটি স্বামী বা স্ত্রী অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যাওজ'। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যাওজ'। তবে আখিরাতে আযওয়াজ অর্থাৎ- জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। জান্নাতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি ঘৃণ্য বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চারিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাদের এসব গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে বলেন:

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾

"তারা (জান্নাতী স্ত্রীগণ) যেন হীরা ও মতি।"[৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন:

﴿وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾

"আর (তাদের জন্য থাকবে) সুন্দর আনতনয়না হূর, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।"[৯] তিনি অন্যত্র আরো বলেন:

﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾

"আরো আছে সমবয়স্কা, পূর্ণ যৌবনা তরুণী।"[১০]

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যাতে জান্নাতী নারীগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।[১১]

জান্নাতী এ স্ত্রীগণ চরিত্রগত, গঠনগত, ভাষাগত ও সৃষ্টিগতভাবে সকল দিক দিয়ে পুতঃপবিত্র। চরিত্রগত পবিত্রতা বলতে বুঝায়- তারা হবে পূর্ণযৌবনা-কুমারী, স্বামী সোহাগিণী, উত্তম আচরণকারিণী ও স্বামীর পূর্ণ আনুগত্যশীলা। আর গঠনগত পবিত্রতা বলতে বুঝায়- মাসিক, নিফাস, বীর্য, প্রস্রাব-পায়খানা, থুথু, নাকের ময়লা ও দুর্গন্ধ এসকল বিষয় থেকে পবিত্র। ভাষাগত পবিত্র হলো- তারা কোনো কটুবাক্য বলবে না। সৃষ্টিগত পবিত্র হলো- তারা হবে টানাটানা চোখবিশিষ্ট আনতনয়না, তারা স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাবে না। এককথায় তারা পূর্ণ সৌন্দর্যের অধিকারিণী, তাদের কোনো ত্রুটি ও কদর্যতা থাকবে না।

فِيهَا خَالِدُونَ (ফীহা খালিদুনা) অর্থাৎ- চিরস্থায়ী আবাস: দুনিয়ার যেকোনো ভালো লাগা বা সুখের সবচেয়ে বড় ভয় হলো তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের এই ভয় দূর করে দিয়েছেন। জান্নাতের সকল নেয়ামত ভোগ করার পর তাদেরকে কখনো সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে না আর সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না; বরং তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবার পর একজন ফেরেশ্তা ঘোষণা দেবে, হে জাহান্নামীরা! আর মৃত্যু নেই। হে জান্নাতীরা! আর মৃত্যু নেই। যারা যে অবস্থায় আছ, সব সময় ঐ অবস্থাতেই থাকবে।[১২]

শিক্ষাসমূহ

সূরা আল-বাক্বারাহ্'র ২৫ নং আয়াত থেকে প্রাপ্ত পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো। যথা-

এক. জান্নাত পাওয়ার জন্য ঈমান ও 'আমলে সলেহ বাধ্যতামূলক।

দুই. আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, তা শতভাগ নিশ্চিত।

তিন. জান্নাতের ফলমূল দুনিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও, স্বাদে ও সুবাসে তা হবে সম্পূর্ণ অনন্য ও অভাবনীয়।

চার. জান্নাতে 'হুর (পবিত্র সঙ্গী)' প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের দাম্পত্য ও মানসিক শান্তির গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

পাঁচ. পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের নিয়ামতরাজির অবিনশ্বরতার কথা বলে মানুষকে তার দিকে আহ্বান করেছেন।

---

[৮] *সূরা আর্-রহমান: ৫৮।*
[৯] *সূরা আল-ওয়া-ক্বি'আহ্: ২২-২৩।*
[১০] *সূরা আন্-নাবা-: ৩৩।*
[১১] *তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান।*
[১২] *সহীহ বুখারী- হা. ৬৫৪৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৫০।*

دروس الحديث / দারসুল হাদীস:

আনুগত্যের সীমারেখা

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَلِيٍّ (ﷺ) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ».

সরল বাংলা অনুবাদ

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নাফরমানির ক্ষেত্রে আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু সৎকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[১৩]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আনুগত্য হবে শুধু বৈধ ও ভালো কাজে। অন্যায় ও অবৈধ কাজে কারো আনুগত্য চলবে না। মন্দ কাজে আনুগত্য করা নিষিদ্ধ। কেবল সৎ ও ন্যায়সঙ্গত আদেশের ক্ষেত্রেই আনুগত্য করতে হয়। ভালো কাজে সঠিক আনুগত্য সমাজ ও সংস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

আনুগত্যের পরিচয়: 'আনুগত্য' অর্থ মেনে নেওয়া, মান্য করা বা মেনে চলা, আদেশ ও নির্দেশ পালন করা, নেতা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় একে إِطَاعَةٌ (ইতায়াত) বলা হয়, যার অর্থ আনুগত্য করা, মেনে নেওয়া। এর বিপরীত শব্দ مَعْصِيَةٌ (মাসিয়াত), যার অর্থ অমান্য করা। ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনের কর্মীদের নেতার আনুগত্য করা আবশ্যিক। সংগঠন বা আন্দোলনের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আনুগত্য হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত। আনুগত্যবিহীন কোনো আন্দোলন তার চূড়ান্ত লক্ষে পৌঁছতে পারে না। তবে আনুগত্য হবে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের ক্ষেত্রে। ব্যক্তির খাম-খেয়ালিমূলক কোনো নির্দেশ মান্য করা যাবে না।

ইসলামে আনুগত্যের গুরুত্ব: ইসলামে আনুগত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃত মুসলিম হওয়ার প্রধান শর্তই হচ্ছে আনুগত্যের অনুশীলন। আনুগত্য ছাড়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কোথাও শান্তি-শৃঙ্খলা আসে না। সর্বত্রই দেখা দেয় সীমাহীন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। অস্থির হয়ে ওঠে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব। আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে বিশদ আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ مَنۡ یُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ یُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এ হলো বিরাট সাফল্য।"[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَ مَنۡ یُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوۡلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَیۡهِمۡ مِّنَ النَّبِیّٖنَ وَ الصِّدِّیۡقِیۡنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِیۡنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیۡقًا﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে আল্লাহ যাদের প্রতি নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন– নবি, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।"[১৫] হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ﷺ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى".

অর্থ: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল, সে যেন আমাকে অস্বীকার করল।[১৬]

** প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৩] *সহীহ বুখারী- ৭২৫৭; সহীহ মুসলিম- ১৮৪০; সুনানে আবূ দাউদ- ২৬২৫; সুনানে নাসায়ী- ৪২০৫; মুসনাদে আহমাদ- ৭২৪; মিশকাত- ৩৬৬৫।*

[১৪] *সূরা নিসা: ১৩।*

[১৫] *সূরা নিসা: ৬৯।*

[১৬] *সহীহ বুখারী- ৬৮৫১।*

কাদের আনুগত্য নিষিদ্ধ?

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন মুসলমানের জন্য যাদের আনুগত্যকে নিষিদ্ধ করেছেন, তারা হলো–

১. অবিশ্বাসী ও মুনাফিক্ব: যে কোনো মুসলমানদের জন্য কাফির ও মুনাফিক্বদের আনুগত্য করা নিষিদ্ধ। এটা আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

﴿وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا﴾

"আর তুমি কাফির ও মুনাফিক্বদের আনুগত্য করো না এবং তাদের যন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও না, আর নির্ভর কর আল্লাহর উপর। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[১৭]

২. গাফেল অন্তর: আল্লাহ উদাসীন ও গাফেলের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন-

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا﴾

"আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিক্র থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।"[১৮]

৩. আহলে কিতাব: আহলে কিতাব তথা ইহুদি-নাসারাদের আনুগত্য করাকেও আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কারণ তারা আপনাকে কাফির বানাবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা-

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের মধ্য হতে কোনো দলের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে।"[১৯]

৪. নিন্দাকারী: চোগলখুর ও পেছনে নিন্দাকারী ব্যক্তির আনুগত্য করাও নিষিদ্ধ। পরবর্তী আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন এভাবে,

﴿هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ﴾

"পেছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখুরী করে বেড়ায় (তার আনুগত্য করা নিষিদ্ধ)।"[২০]

[১৭] *সূরা আহ্যা-ব: ৪৮।*
[১৮] *সূরা কাহ্ফ: ২৮।*
[১৯] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১০০।*
[২০] *সূরা কলম: ১১।*

৫. সীমা লঙ্ঘনকারী: পাপী ও সীমা লঙ্ঘনকারীর আনুগত্য করা নিষিদ্ধ। একাধিক আয়াতে সীমা লঙ্ঘনকারীদের আনুগত্য করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ﴾

"যে ভালো কাজে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ।"[২১] অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿وَلَا تُطِيْعُوْۤا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

"আর তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না।"[২২]

৬. অনুমান নির্ভর মানুষ: পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ অনুমাননির্ভর কথা বলে এবং ধারণার অনুসরণ করে। এ জন্য বেশির ভাগ মানুষের আনুগত্য করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ﴾

"তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে চলে, তারা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করে না।"[২৩]

৭. মিথ্যাবাদী: যারা মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যাচার করে তাদের আনুগত্য করতে আল্লাহ নিষেধ করে বলেন-

﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ﴾

"অতএব তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবে না।"[২৪]

৮. বেশি শপথকারী: অনুরূপভাবে বেশি শপথকারী ব্যক্তির আনুগত্য করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন-

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ﴾

"তুমি তার অনুসরণ করো না, যে বেশি বেশি কসম খায় আর যে (বার বার মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে মানুষের কাছে) লাঞ্ছিত।"[২৫]

[২১] *সূরা কলম: ১২।*
[২২] *সূরা শু'আরা-: ১৫১।*
[২৩] *সূরা আনআম: ১১৬।*
[২৪] *সূরা কলম: ৮।*
[২৫] *সূরা কলম: ১০।*

আনুগত্যের সীমারেখা: ইসলাম আনুগত্যের সীমাহীন গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মজবুতভাবে তার সীমারেখাও টেনে দিয়েছে। এসংক্রান্ত কয়েকটি নীতিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো−

১. ইসলামবিরোধী কাজে কারো আনুগত্য নয়: আমীর বা নেতার আদেশ ততক্ষণ মানা যাবে, যতক্ষণ তিনি ইসলামের সীমার ভেতর থাকেন। ইসলামবিরোধী কাজে কারো আনুগত্যের সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যতক্ষণ মহান আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোনো মান্যতা ও আনুগত্য নেই।[২৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «السَّمعُ والطاعةُ على المرءِ المسلمِ فِيْمَا أحب وأكره مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের (তার শাসনকর্তার নির্দেশ) শোনা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য; তার মনঃপূত হোক বা না হোক, যতক্ষণ না তাকে গুনাহের দিকে নির্দেশ করে। কিন্তু যদি তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তা শোনা ও আনুগত্য করা কর্তব্য নয়।[২৭]

২. আনুগত্যের মানদণ্ড দ্বীনদারি ও যোগ্যতা: আনুগত্যের প্রশ্নে ইসলাম ব্যক্তি বা বংশকে প্রাধান্য দেয়নি। প্রাধান্য দিয়েছে দ্বীনদারি, যোগ্যতা ও ন্যায়ানুগতাকে। এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

اَسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

তোমরা শুনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর হাবশী গোলাম শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিসমিসের ন্যায়।[২৮]

৩. অন্ধ অনুকরণ নিষিদ্ধ: বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে কোনো কিছুর অন্ধ অনুকরণ ইসলামে অনুমোদিত নয়। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ﴾

“যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তারা বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না এবং সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?”[২৯]

আনুগত্যের ভিত্তি: আনুগত্যের ভিত্তি হলো ঈমান। যার ঈমান যত বেশি পরিচ্ছন্ন এবং নির্ভেজাল তার আনুগত্য তত বেশি পরিচ্ছন্ন এবং নির্ভেজাল। যার ঈমান যত মজবুত ও সুন্দর, তার আনুগত্য তত মজবুত ও সুন্দর। কতিপয় অনুসরণীয় আনুগত্যের উদাহরণ: আনুগত্যের সর্বাগ্রে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম উল্লেখ করা যায়; যিনি রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে হিজরতের ইঙ্গিত পেয়ে রাসূলের অপেক্ষায় প্রহর গুনেছেন। ‘উমার((রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র নির্দেশ পেয়ে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেনাবাহিনীর শিরস্ত্রাণ খুলে দিয়ে নতুন সেনাপতির মাথায় পরিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। আবূ জান্দাল মক্কার মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত অবস্থায় শিকল নিয়ে হুদাইবিয়ার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর নবী ও সাহাবিদের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল (ﷺ) সন্ধির খাতিরে আবূ জান্দালকে আবার মক্কায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। আবূ জান্দাল ও উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মনের কষ্ট চাপা দিয়ে সেদিন রাসূলে করিম((ﷺ)-এর নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন।

রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য: হাদীসে এসেছে−

---

[২৬] *সহীহ বুখারী- ৭১৪৪; সহীহ মুসলিম- ১৮৪৯।*

[২৭] *সহীহ বুখারী- ৭১৪৪; সহীহ মুসলিম- ১৮৩৯; সুনানে আবূ দাঊদ- ২৬২৬; সুনানে তিরমিযী- ১৭০৭; সহীহ আল জামি‘- ৩৬৯৩; আহমাদ- ৬২৭৮।*

[২৮] *সহীহ বুখারী- ৭১৪২; সুনানে ইবনু মাজাহ্- ২৮৬০; মুসনাদে আহমাদ- ১২১২৬; সহীহ আল জামি‘- ৯৮৫।*

[২৯] *সূরা মায়িদাহ্: ১০৪।*

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (ﷺ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِيْ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى اَمِيْرِيْ فَقَدْ عَصَانِيْ.

অর্থ: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে আমার আনুগত্য করল, সে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল, সে মহান আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমিরের আনুগত্য করল, তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমিরের আদেশ অমান্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল।[৩০]

নাফরমানের আনুগত্যের প্রভাব: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ত্যাগ করে কাফির-মুশরিক ও অন্যদের আনুগত্য করলে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। যেমন-

১. সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়া: আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে কাফির-মুশরিকদের আনুগত্য করলে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে।”[৩১]

২. কুফ্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন: কাফির-মুশরিকদের আনুগত্য করলে এরা মুসলমানদেরকে কুফ্রীর দিকে ধাবিত করে দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ﴾

“হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোনো একটি দলের কথা মেনে নাও, তাহলে ওরা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে ফেলবে।”[৩২]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً﴾

“তারা চায় তোমরা কাফির হয়ে যাও যেমন তারা কাফির হয়ে গেছে। যাতে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাও।”[৩৩]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا﴾

“বস্তুতঃ যদি তারা সক্ষম হয়, তবে তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে।”[৩৪]

৩. পরকালীন জীবনে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে: আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে কাফিরদের আনুগত্য করলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ﴾

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।”[৩৫]

৪. 'আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে: যারা আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করে কাফিরদের অনুসরণ করে তাদের 'আমলসমূহ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾

“নিশ্চয়ই যারা কুফ্রী করে ও মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনোই আল্লাহর কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্বর তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট করবেন।”[৩৬]

উপসংহার

মানুষকে আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি দেখতে চান, কে তাঁর সবচেয়ে উত্তম আনুগত্য করতে পারে। মহান আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া প্রকৃত মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। সেটা হারাম। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য হতে পারে না।[৩৭]

অসৎ লোকের আনুগত্য করা মানে নিজের পতন ডেকে আনা। এটি সমাজকে নষ্ট করে এবং মানুষকে অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। ভালো ও বৈধ কাজের বাইরে কারো আনুগত্য করা ঠিক নয়।

---

[৩০] *সহীহ বুখারী- ৬৭১৮।*
[৩১] *সূরা আল-আহ্যা-ব: ৩৬।*
[৩২] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১০০।*
[৩৩] *সূরা নিসা: ৮৯।*
[৩৪] *সূরা বাক্বারাহ্: ২১৭।*
[৩৫] *সূরা নিসা: ১৪।*
[৩৬] *সূরা মুহাম্মাদ: ৩২।*
[৩৭] *জামিউস সগীর- ৯৮৮৪।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ

ইসলামে কন্যা সন্তান লালনপালনের মর্যাদা

মূল: শাইক মানসুর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস সক‘উব*
অনুবাদ: শাইখ মুফতি মো. আব্দুর রউফ মাদানী*

সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলামীনের জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর ও তাঁর সমস্ত সাহাবীদের ওপর।

কন্যা সন্তান লালনপালন করা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও একটি মহা পুণ্যের কাজ। ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে, নারীর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং নারীর প্রতি সদাচারণকে সাওয়াব লাভের ও জান্নাতে প্রবেশের একটি বড় মাধ্যম বানিয়েছে।

যখন আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে সন্তান প্রদানের মাধ্যমে আপনার ওপর নেয়ামত দান করেন তখন এই সন্তান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটি বিরাট নেয়ামত, আপনার ওপর আবশ্যক যায় এই নেয়ামতের ওপর মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কারণ কত দম্পতি আছে যারা সন্তান থেকে বঞ্চিত অথচ আপনি আপনার রবের পক্ষ থেকে তার অনুগ্রহে ও দয়ায় সন্তান লাভ করেছেন।

কন্যা সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্য ও বাড়ির জন্য একটি নেয়ামত। তারা হলো জাহান্নাম হতে পর্দাস্বরূপ যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী (ﷺ) বলেছেন: যাকে কোনো কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হলো, অতঃপর সে তাদের প্রতি দয়া ও সদাচারণ করল, তাহলে ঐ কন্যারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দাস্বরূপ হবে।

যদি কন্যা সন্তানকে যথাযথভাবে লালনপালন করা হয়, তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা হয় তাহলে তারাই হবে কিয়ামতের দিন নবী (ﷺ)-এর সাহচর্য লাভের উপায়। সহীহ হাদীসে এসেছে– যে ব্যক্তি দু’টি কন্যা সন্তানকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণ দিয়ে মানুষ করবে, নবী (ﷺ) দুই আঙ্গুল একত্রিত করে দেখিয়ে বললেন, কিয়ামতের দিন আমি আর সে এরকম থাকব।

আর এ কারণেই কোনো মুসলিমকে আল্লাহ ছেলে দিক অথবা মেয়ে দিক, সেটাতেই খুশি হতে হবে এবং তাকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য যেটা নির্বাচন করেছেন, সেটাই কল্যাণকর। তাইতো সালাফদের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন: পুত্র সন্তান নেয়ামত, আর কন্যা সন্তান পুণ্য তথা নেকি। আল্লাহ তা‘আলা নেয়ামতের ওপর হিসাব নিবেন কিন্তু তিনি পুণ্যের ওপর প্রতিদান দিবেন।

সৃষ্টির সেরা আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) ছিলেন চার কন্যার বাবা। তার কন্যাদের সাথে তার আচরণ ও দয়া ছিল মহান।

ওহে কন্যার পিতা! জেনে রাখুন, কন্যা সন্তানের জন্য তাদের পিতার ওপর সুবিদিত অধিকার ও আবশ্যকীয় দায়িত্ব রয়েছে, যদি কোনো পিতা সে অধিকার ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ত্রুটি করে, তাহলে সে তাদের ওপর জুলুম করল, আমানতের খিয়ানত করল এবং কন্যা সন্তান প্রতিপালন ও তাদের প্রতি সদাচারণের বিষয়ে যে মহাপুরস্কারের কথা হাদীসে এসেছে সেটা অর্জনে সে অবহেলা ও ত্রুটি করল।

কন্যা সন্তানের প্রথম অধিকার: তাকে সততার ওপর গড়ে তোলা ও প্রতিপালন করা, তার অন্তরে তাক্বওয়ার বীজ বপন করা এবং তার চেতনার মধ্যে আল্লাহ ভীতি ও মহান আল্লাহর স্মরণকে বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয় অধিকার: পোষাকে ও পর্দায় শালীনতা ও লজ্জাশীলতার ওপর তাকে গড়ে তোলা, যা পড়লে ও দেখলে তার মধ্যে লজ্জা বৃদ্ধি করবে, তার থেকে পর্দাহীনতা ও হারাম কামনা-বাসনা দূর করবে এমনটাই তার জন্য নির্বাচন করে দিতে হবে এবং শৈশব থেকেই তাকে পরপুরুষদের সঙ্গ থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে; কারণ এটা তার মধ্যে কল্যাণের প্রভাব ফেলে।

তার আরো একটি অধিকার হলো– যখন তাকে বিবাহের জন্য কেউ যোগ্য পাত্রের প্রস্তাব নিয়ে আসবে তখন তাকে বিবাহ দিতে হবে, তাকে বিবাহ থেকে আটকে রাখা যাবে না; কারণ নবী (ﷺ) বলেছেন: যখন তোমাদের কাছে এমন পাত্রের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার চরিত্র ও দীনদারিতে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন তোমরা তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও, যদি তোমরা তা না করো, তাহলে জমীনে ফেতনা হবে ও বিরাট অপকর্ম হবে।

একজন পিতা তার সন্তান থেকে– হোক সে পুত্র কিংবা কন্যা, সবচেয়ে বড় যে ফল লাভ করে, তা হলো সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় অথচ তার কবরে তার ‘আমল আসতে থাকে; কারণ সে তার সন্তানদেরকে কল্যাণ ও সততার ওপর গড়েছিল। আর তাই তো রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন সব ‘আমল বন্ধ হয়ে যায় কেবল তিনটি ছাড়া: এর মধ্যে একটি হলো– তার সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু‘আ করতে থাকে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদেরকে সৎ সন্তান করে দিন, তাদেরকে আপনি হেফাযত করুন, তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করুন এবং তাদেরকে লালনপালনে আমাদেরকে সাহায্য করুন –আমীন।

সৌদি আরবের ইসলামিক এফেয়ার্স মন্ত্রণালয়ের দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগের আল কাসিম শাখার বিশিষ্ট সদস্য এবং জামিউল হাবলাইন মসজিদের ইমাম ও খতীব।

উস্তাযুল ফিকহ ওয়াল হাদীস, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ওযূ ও আধুনিক বিজ্ঞান

মো. মতিউর রহমান*

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সালাত আদায়ের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের জন্য 'ওযূ' করা বাধ্যতামূলক। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণায় দেখা গেছে, এটি কেবলই একটি ধর্মীয় আচার নয়; বরং সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকার এক অনন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া। কুরআন, হাদীস এবং আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে ওযূর প্রধান উপকারিতাগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো–

১. পবিত্রতা ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা: আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ওযূর গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন: "হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো, তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করো...।"[১]

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"[২]

"'উসমান (রাঃ)'র আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রাঃ), তিনি 'উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-কে দেখেছেন, তিনি ওযূর জন্য একটি পাত্রে পানি আনিয়ে দুই হাতের উপর ঢেলে তিনবার ধুলেন। তারপর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন, এরপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়েছিলেন। তারপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর উভয় পা (গোড়ালি পর্যন্ত) তিনবার ধুয়ে বললেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করার পর এমনভাবে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে যাতে তার অন্তরে কোনো কল্পনার উদয় হয়নি; তবে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৩]

বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ: আমাদের হাত, মুখ ও পা সারাদিন উন্মুক্ত থাকে এবং ক্ষতিকর ধূলিকণা ও ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে। ওযূর মাধ্যমে দিনে পাঁচবার এই অঙ্গগুলো পরিষ্কার করার ফলে ক্ষতিকর রোগজীবাণু বা প্যাথোজেন সহজেই দূর হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস শ্বাসতন্ত্র ও গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল ইনফেকশনের ঝুঁকি প্রায় ৪০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।

২. কুলি করা ও দাঁতের যত্ন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওযূর সময় কুলি করা এবং ওযূর পূর্বে মেসওয়াক বা দাঁত পরিষ্কার করার ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "যদি না আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হতো, তবে আমি তাদের প্রতি সালাতের ওযূর সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৪]

বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ: খাবারের পর মুখের কোণায় এবং দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা জমে ক্ষতিকর অ্যাসিড ও প্লাক তৈরি করে। দিনে অন্তত পাঁচবার ওযূর সময় ভালোভাবে কুলকুচি করার ফলে মুখের লালা গ্রন্থি সক্রিয় হয় এবং মুখের ভেতরের অম্লত্ব বা অ্যাসিডের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে। এটি মাড়ির রোগ ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

৩. নাক পরিষ্কার করা ও শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষা: রাসূল (ﷺ) বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ ওযূ করে, সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং তা ঝেড়ে পরিষ্কার করে।"[৫]

ওযূর পর দু'আ পড়ার ফযীলত: ওযূ শেষ করার পর বিশেষ কিছু দু'আ পাঠ করলে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে, অতঃপর বলে– 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'।[৬]

বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ: বিজ্ঞানীদের মতে, নাকের ভেতরের লোম ও আর্দ্র স্তর বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা ও রোগজীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। একে বলা হয় শরীরের প্রাথমিক ছাঁকনি। সৌদি আরবের তায়েফ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে পাঁচবার নাসারন্ধ্র পানি দিয়ে পরিষ্কার করার ফলে নাকের ভেতরের ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যা সাইনাস ইনফেকশন, কোল্ড-অ্যালার্জি এবং অন্যান্য শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর।

৪. কিয়ামতের দিন ওযূর অঙ্গগুলো যেভাবে জ্বলজ্বল করবে: কিয়ামতের কঠিন ময়দানে রাসূল (ﷺ) তাঁর উম্মতদেরকে ওযূর চিহ্নের মাধ্যমে চিনে নেবেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, ওযূর প্রভাবের কারণে তাদের হাত, পা ও কপাল উজ্জ্বল (জ্বলজ্বল) করতে থাকবে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের এই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, সে যেন তা করে (অর্থাৎ- সুন্দরভাবে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করে)।"[৭]

৫. শরীরের বৈদ্যুতিক ভারসাম্য রক্ষা ও মানসিক প্রশান্তি: ওযূর মাধ্যমে পাপের ক্ষয় ও মনের প্রশান্তি অর্জিত হয়।

**সহকারী কর্মকর্তা (পরিদর্শন বিভাগ), বাংলাদেশ আহলে হাদীস শিক্ষা বোর্ড।*

[১] *সূরা আল-মায়িদাহ: ৬।*
[২] *সহীহ মুসলিম।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪২৭।*
[৪] *সহীহ বুখারী- হা. ৮৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫২।*
[৫] *বুখারী- ১৬১, বাংলা সংস্করণে ই. ফা. বাং, মা. শা., ১৬২।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩৪।*
[৭] *সহীহ বুখারী- হা. ১৩৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৪৬।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "কোনো মুসলিম যখন ওযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধোয়, তখন তার চোখের দ্বারা করা সমস্ত গুনাহ পানির ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়...।"[১]

বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ: মানুষের স্নায়ুতন্ত্র ও ত্বকের মাঝে একটি মৃদু বায়ো-ইলেকট্রিক ফিল্ড বা স্থির বিদ্যুৎ কাজ করে। সারাদিন স্ক্রিন ব্যবহার করা এবং মানসিক চাপের কারণে এই বৈদ্যুতিক ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে, যা অনিদ্রা ও বিষণ্ণতার কারণ হতে পারে। ইস্তাম্বুল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ওযূর সময় পানি স্পর্শের ফলে এই বায়ো-ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল প্রায় ৩০% পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থায় চলে আসে, যা গভীর ঘুম এবং মানসিক প্রশান্তিতে সাহায্য করে।

৬. চোখের দৃষ্টিশক্তি ও ত্বকের সুরক্ষা:

চোখের যত্ন– ওযূর সময় মুখের পাশাপাশি চোখ ধোয়ার ফলে চোখের অশ্রুনালী সচল থাকে এবং এটি শুষ্কতা থেকে রেহাই পায়।

ত্বকের উজ্জ্বলতা– নিয়মিত ওযূর ফলে ত্বকের মৃত কোষগুলো ঝরে যায় এবং লোমকূপ উন্মুক্ত হয়। ফলে ত্বকের তৈলাক্ততা দূর হয় এবং ব্রণ ও ইনফেকশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একে বিশেষজ্ঞরা এক ধরনের "ন্যাচারাল ফেসিয়াল ম্যাসাজ" বলে অভিহিত করেছেন।

ওযূ কেবল পরকালীন 'ইবাদতের পূর্বশর্তই নয়, এটি মানবদেহের প্রতিটি সিস্টেমকে সুস্থ ও সতেজ রাখার এক অনন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে যে পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান আজ গবেষণার মাধ্যমে তার যৌক্তিকতা ও উপকারিতাই প্রমাণ করছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ: ওযূর বৈজ্ঞানিক উপকারিতার ক্ষেত্রে "সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ফলে শ্বাসতন্ত্র ও গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল (উদরাময় বা ডায়রিয়া) ইনফেকশনের ঝুঁকি প্রায় ৪০% পর্যন্ত কমে যায়"-এই তথ্যটির মূল উৎস মূলত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং আমেরিকার রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র। এই দাবির সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক রেফারেন্স ও গবেষণাপত্রগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল বা ডায়রিয়াজনিত ইনফেকশন (ঝুঁকি ৪০% হ্রাস) মেডিকেল জার্নালগুলোতে প্রকাশিত একাধিক সিস্টেমেটিক রিভিউতে দেখা গেছে যে, সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ার অভ্যাস ডায়রিয়াজনিত রোগ প্রায় ৪০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।

The Cochrane Library Systematic Review (WHO সমর্থিত): বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে গঠিত "Cochrane Database of Systematic Reviews"-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়ার ঘটনা প্রায় ৩০% থেকে ৪০% পর্যন্ত হ্রাস পায়।

The Lancet Infectious Diseases জার্নাল: বিখ্যাত গবেষক ভ্যালেরি কার্টিস (Valerie Curtis) এবং স্যান্ডি কেয়ার্নক্রসের (Sandy Cairncross) একটি যুগান্তকারী গবেষণা (২০০৩) প্রকাশ করে যে, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস ডায়রিয়ার ঝুঁকি ৪৭% পর্যন্ত কমাতে পারে।

২. শ্বাসতন্ত্রের বা ফুসফুসের ইনফেকশন (Respiratory Infections): শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ (যেমন- সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া) মূলত হাত থেকে নাক, মুখ ও চোখে জীবাণু ছড়ানোর মাধ্যমে ঘটে।

The Lancet (২০২৩)-এর মেটা-অ্যানালাইসিস: ১৬০,০০০ মানুষের ওপর চালানো তিন মহাদেশের বিভিন্ন গবেষণার একটি সমন্বিত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়ার ফলে তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ (Acute Respiratory Infection ARI) উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। উচ্চ শ্বাসতন্ত্রের ইনফেকশন (Upper Respiratory Infection) কমে প্রায় ২৬% এবং নিম্ন শ্বাসতন্ত্রের ইনফেকশন (Lower Respiratory Infection, যেমন- নিউমোনিয়া) কমে প্রায় ২২%।

American Journal of Public Health (AJPH): ২০০৮ সালে প্রকাশিত একটি বড় আকারের গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত হাত পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত রাখলে সাধারণ শ্বাসতন্ত্রের রোগ (যেমন- ঠাণ্ডা লাগা বা ইনফ্লুয়েঞ্জা) প্রায় ১৬% থেকে ২১% এবং কিছু ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি হ্রাস পায়।

৩. ওযূর সাথে এর সরাসরি সংযোগ: ওযূ করার সময় আমরা শুধু একবার হাত ধুই না; বরং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পর্যায়ক্রমে– ⇨ মুখে তিনবার কুলি করি (যা মুখের অভ্যন্তরের ব্যাকটেরিয়া পরিষ্কার করে)। ⇨ নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করি (যা শ্বাসতন্ত্রের প্রবেশদ্বারকে সুরক্ষিত রাখে)। ⇨ কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করি (যা ত্বকে থাকা প্যাথোজেন দূর করে)।

যেহেতু একজন মুসলিমকে দিনে অন্তত ৫ বার সালাত আদায় করতে হয় এবং প্রতিবার সালাতের আগে এভাবে হাত, মুখ ও নাক পানি দিয়ে ধুতে হয়, তাই বিজ্ঞানীদের মতে এই অভ্যাসের কারণে ওযূরত ব্যক্তিরা প্রাকৃতিকভাবেই এই ৪০% বা তার কাছাকাছি রোগমুক্তির সুবিধার আওতাভুক্ত থাকেন।

আমরা যেন আমাদের প্রত্যহিক জীবনে ওযূর গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরভাবে ওযূ করি এবং ইসলামী জীবনধারার পাশাপাশি বিজ্ঞান গত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কথাগুলো মূল্যায়ন করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই সমস্ত জীবন বিধ্বংসকারী ব্যাকটেরিয়া গুলো থেকে হেফাজত করেন –আমিন।

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৪।*

التربية والحضارة / শিক্ষা ও সভ্যতা

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[তৃতীয় পর্ব]

ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় ইসলামী সভ্যতার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তাওহীদভিত্তিক বিশ্বদৃষ্টি, জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি ইসলামী সভ্যতাকে অনুকরণীয় করে তুলেছে। তাওহীদভিত্তিক বিশ্বদৃষ্টি শুধু একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি মানুষের চিন্তা, চরিত্র, জ্ঞান, সভ্যতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে মহান আল্লাহর একত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলে। এই বিশ্বদৃষ্টি (Tawhidi World View) মানুষকে নৈতিকতা, দায়িত্বশীল, ন্যায়পরায়ণ ও মানবকল্যাণে নিবেদিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয়জগতের সফলতার পথ প্রদর্শন করে। অনুরূপভাবে জ্ঞান ও গবেষণা একত্বের ভিত্তিকে মজবুত করে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম একটি জ্ঞানভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। কুরআন ও সুন্নাহ মানুষের চিন্তা, পর্যবেক্ষন, অনুসন্ধান এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করেছে। ইসলামে জ্ঞানার্জন শুধু পার্থিব উন্নতির জন্য নয়; বরং মহান আল্লাহকে চেনা, মানব কল্যাণ সাধন এবং ন্যায়ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যমে। শুধু সভ্যতার সৃজন নয়; এসব প্রতিনিয়ত পুষ্টি সাধনে জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার আক্ষরিক প্রতিফলন ন্যায় বিচার ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ন্যায্যতার মানদণ্ডে সমাজ পরিচালনা ইসলামী গবেষণার অন্যতম বিষয়।

জ্ঞান-গবেষণার উৎসাহ সৃষ্টিতে একটি পরিশীলিত সমাজের ফ্লেভার অনুভূত হয়। নায্যতার ভিত্তিতে কুরআনিক বিধানাবলীর আক্ষরিক চর্চা মানুষের আস্থা মজবুত করে। কুরআনুল কারীমে বিধৃত আছে–

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِی الْقُرْبٰى﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচার, সদাচার এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।"[১]

আইনের প্রতি দারুণ রকম শ্রদ্ধাশীল মুসলিম জাতি এমনিভাবে সমাজ সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলে। ব্যক্তি সম্পর্কের নানান দিক উন্মোচন করে সৃষ্টিতত্ব আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى﴾

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি... ।"[২]

নারীর মর্যাদা ও দাস প্রথার মূলোৎপাটন নবীজীর কর্মকাণ্ড মানবিকীকরণে উৎসাহ যোগায়। ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের অধিকার মর্যাদা স্বীকৃত।

ইসলামী সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– ধর্মীয় সহনশীলতা ও বহুসাংস্কৃতিক অবস্থান। মহানবী মদীনায় মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। ইসলাম ধর্ম সহনশীলতা ও বহু সাংস্কৃতিক সহবস্থানের একটি ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শের ধারক। ইসলাম নিজের বিশ্বাস ও 'আক্বীদায় দৃঢ় থাকার পাশাপাশি অন্যদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা এবং নাগরিক অধিকারকে সম্মান করা শিক্ষা দেয়। কুরআন, সুন্নাহর আলোকে ন্যায়বিচার সহনশীলতা ও পারস্পারিক সম্মানের ভিত্তিতে মানুষ একটি সভ্য সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলে। বহু সাংস্কৃতির চেতনার বিকাশে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মিত হয়।

একটি সমাজের উন্নতির পরিচায়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে ইসলাম একটি ইতিবাচক, প্রগতিশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করেছে। জ্ঞানঅর্জন, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ উদ্ভাবন এবং মানব কল্যাণ এসবই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অংশ। কুরআন-সুন্নাহ্ জ্ঞানচর্চার নির্দেশনা প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধন ইসলামি সভ্যতাকে পুষ্টি দান করেছে।

একটি সভ্যতার উন্নয়নের মানদণ্ড হলো শিক্ষা ও জনকল্যাণ। শিক্ষাবিস্তার ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

[১] সূরা আন্-নাহ্ল: ৯০।
[২] সূরা আল হুজুরা-ত: ১৩।

মাধ্যমে বিকশিত সভ্যতা পল্লবিত হয়। জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উপহৃত সুফল সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছায়। ইসলামি সভ্যতার ঐতিহাসিক বিকাশ প্রমাণ করে যে, এটি কেবল একটি ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়; বরং জ্ঞান, নৈতিকতা, বিজ্ঞান, শিক্ষা, প্রশাসন ও মানব কল্যাণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি বিশ্বজনীন সভ্যতা। নববী যুগ থেকে ‘আব্বাসীয় স্বর্ণযুগ, আন্দালুস এবং উসমানীয় পর্ব পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতা বিশ্ব ইতিহাসে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে এর অবদান সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে ইসলামি সভ্যতার ঐতিহাসিক বিকাশ অনিবার্যভাবে আলোচ্য বিষয়।

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার দাবি রাখে।

আধুনিক সভ্যতা (Modern Civilization) বলতে সাধারণত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শিক্ষা, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিশ্বায়নের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সমকালীন মানব সভ্যতাকে বোঝায়। এর বিকাশ মূলত ইউরোপীয় নবজাগরণ (Renaissance) ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন (Relazias Information muvment) বৈজ্ঞানিক বিপ্লব (Scientific Revolution)-এর ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়। বলাবাহুল্য আধুনিক সভ্যতার অনেক মৌলিক ভিত্তি বিশেষতঃ জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনের ক্ষেত্রে –ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইতিহাসে স্বীকৃত।

আধুনিক সভ্যতার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি এবং ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক উন্নয়ণ। তবে এর সাথে নৈতিকতা, পরিবেশ, পরিবার ও সামাজিক মূল্যবোধের ঢিলে-ঢালা সম্পর্কের কারণে বিতর্ক বিদ্যমান।

আমরা ইতিপূর্বে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি যে, আধুনিক সভ্যতা একটি সুসংগঠিত সামাজিক ব্যবস্থা। যেখানে মানুষ জ্ঞান, শিক্ষা, আইন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আধুনিক সভ্যতা এই ধারারই একটি উন্নতরূপ যার বৈশিষ্ট্য হলো- যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, প্রযুক্তি নির্ভর জীবন, মানবাধিকারের স্বীকৃতি এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের বিস্তার। সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের মতে, আধুনিক সভ্যতা কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের নাম নয়; এটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তনেরও একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভরতা, যুক্তিবাদ ও গবেষণামুখিনতা, শিল্পায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণ, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা ইত্যকার বিষয়াদি আধুনিক সভ্যতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ণ, নগরায়ণ বিশেষত বিশ্বায়ণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক সভ্যতায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে গড় আয়ু বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ, নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধিসহ বৈশ্বিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক সমকালীন ইসলামি চিন্তা ও সভ্যতাতাত্ত্বিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একদিকে আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিশ্বকে নতুন রূপ দিয়েছে; অন্যদিকে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গজীবন ব্যবস্থা হিসেবে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, জ্ঞানচর্চা ও মানব কল্যাণের উপর গুরুত্বারোপ করে। তাই প্রশ্ন ওঠে- ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতা কি পরস্পর বিরোধী, নাকি পরস্পরের পরিপূরক? ঐতিহাসিক ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আধুনিক সভ্যতার বহু ইতিবাচক উপাদানের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের গভীর সাদৃশ্য আছে।

আধুনিক সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি হলো জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবন। ইসলামও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু তাই নয় জ্ঞানচর্চাকে ‘ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। জ্ঞানচর্চার ইঙ্গিতবাহী বেশকিছু আয়াতে কারীমা আমরা দেখতে পাই।[১] জ্ঞানচর্চার তাগিদ থেকেই মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমরা উল্লেখ করেছি যে, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও দার্শনিকেরা বিশ্বজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে তাদের গবেষণা ইউরোপীয় নবজাগরণ ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবকে প্রভাবিত করে। এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, আধুনিক সভ্যতার বিকাশে ইসলামি সভ্যতার যোগসূত্র রয়েছে।

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

[১] সূরা আল-‘আলাক্ব: ১; সূরা আয্-যুমার: ৯।

الحياةالمستنيرة / আলোকিত জীবন

বাংলার নবজাগরণের বীর মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

ভূমিকা: বাংলার ইতিহাসে কিছু নাম আছে, যেগুলো উচ্চারণ করলেই বুকের ভেতর বিদ্রোহ জেগে ওঠে, ঈমান মাথা তুলে দাঁড়ায়। তিতুমীর তেমনই এক নাম। তিনি কোনো রাজা ছিলেন না, কোনো সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও নন তিনি ছিলেন একজন মুসলিম ঘরের সন্তান, যিনি অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন মহান আল্লাহর দ্বীনের জন্য। ঊনিশ শতকের সূচনালগ্নে ব্রিটিশ শাসন, নীলকরদের শোষণ এবং জমিদারি নিপীড়নে যখন বাংলার মুসলমান সমাজ আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল, ঠিক সেই সময় তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদের ভাষা। ঊনবিংশ শতকের বাংলা ছিল মুসলমানদের জন্য এক দীর্ঘ অন্ধকার রাত। ব্রিটিশ শাসনের ছায়ায় নীলকরদের চাবুক, জমিদারদের খাজনা আর ধর্মীয় অবমাননার বোঝা মুসলমান সমাজকে নুয়ে ফেলেছিল। মানুষ তখন বেঁচে ছিল, কিন্তু আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল। এই নিঃশব্দ অপমানের সময়েই ইতিহাসের পেছনের সারি থেকে উঠে এলেন মীর নিসার আলী যিনি পরে পরিচিত হন তিতুমীর নামে।

জন্ম: ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তৎকালীন ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের চাঁদপুর গ্রামে তার জন্ম। প্রকৃত নাম, সাইয়্যেদ মীর নিসার আলী। ছোট বেলায় অসুস্থতার কারণে তিতু জাতীয় ঔষুধ মজা করে খাওয়ার কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় তেতু, তেতু থেকে তিতু, তিতু থেকে তার বংশের মীর যোগ করে হলো তিতুমীর। পিতা ছিলেন সাইয়্যেদ হাসান আলী।

শিক্ষা জীবন: ৪ বছর বয়সে মক্তবের মাধ্যমে পড়াশোনা শুরু করেন। ছোট বেলা থেকে তিনি কুস্তিগীর ছিলেন। পড়াশোনার জীবনে তিনি আরবি, বাংলা, উর্দু, ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৮ বছর বয়সে কুরআনের হাফেজ হন। তিনি ইসলামী ধর্মীয় জ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রে ও পড়াশোনা করেন। তিনি সেখানকার কুস্তি খেলায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। একবার কলকাতায় এক কুস্তিখেলায় জয়ী হয়ে তার নাম বীর বাহাদুর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি আরো শিখেন তলোয়ার চালানো, তীর চালানো ও লাঠি খেলা। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন জায়গা গিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধ কৌশল রপ্ত করেন। বিভিন্ন স্থানে ঘুরাঘুরির মাধ্যমে তিনি দেখলেন বাংলার মানুষ এতটা ভালো নেই। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ কাজ করলেও সঠিক ইসলাম মেনে চলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

হজ্জ পালন: যৌবনে পদার্পণ করার পর মীর নিসার আলী জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ১৮২২ সালে মক্কায় গমন করেন। সেখানেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। মক্কায় তিনি সাক্ষাৎ লাভ করেন উপমহাদেশের তাওহীদী আন্দোলনের অগ্রদূত সাইয়েদ আহমেদ ব্রেলভী (রহিমাহুল্লাহ)'র সাথে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে তিতুমীর উপলব্ধি করেন, ইসলামের সংকট শুধু রাজনৈতিক নয়; বরং 'আক্বীদাহ্গত। তিনি তাওহীদ, সুন্নাহ, আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্কারের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানেই তৈরি হয় ভবিষ্যতের সেই আগুনঝরা বিপ্লবীর আত্মা।

বাংলায় প্রত্যাবর্তন– সংগ্রামী জীবন: বাংলায় নিজ গ্রাম চাঁদপুরে ফিরে এসে তিতুমীর শুরু করেন সমাজ সংস্কারের কাজ। তিনি মানুষকে কুসংস্কার, শিরক ও বিদ'আত থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি নীলকর ও জমিদারদের জুলুমের বিরুদ্ধেও মুখ খুলতে শেখান। তাঁর আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চব্বিশ পরগনা ও আশপাশের অঞ্চলে। নির্যাতিত কৃষক ও সাধারণ মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্বে আশ্রয় খুঁজে পায়। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে ঘোষণা করলেন আল্লাহ এক, তাঁর 'ইবাদতে কোনো শরিক নেই। কবর, তাবিজ ও কুসংস্কার মুসলমানকে দুর্বল করে জুলুম মেনে নেওয়া, এগুলো ইসলাম ধর্মের আন্তর্ভুক্ত নয়। এই কথা ছিল তৎকালীন জমিদার-শাসকদের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ, তিতুমীর মানুষকে অস্ত্র নয়; বরং মেরুদণ্ড ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর আহ্বানে বহু মুসলমান উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষজন সাড়া দিয়েছিল। অনেক অমুসলিমরাও ইসলামের সুশীতল ছায়া গ্রহণ

---

*মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

করছিল। এতে করে তিতুমীরের ঐ অঞ্চলে জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়ে যায়। তিতুমীরের এই জাগরণ স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তখনকার ইংরেজ বেনিয়াদের শাসনে হিন্দু জমিদাররা বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক সেজে বসে ছিল। তারা নিজেরাও জানতো তারা যে শাসক হওয়ার উপযুক্ত নয়। তবে তারা ইংরেজদের বেশি কড় দিয়ে নিজেদের শাসক করে নেয়। তিতুমীরের এই জাগরণ প্রত্যক্ষ করে তারা মুসলমানদের ওপর ইসলামী নাম রাখা, দাঁড়ি রাখা, মসজিদ নির্মাণ করা ও তাতে সালাত আদায় করার উপরেও কড় জারি করলেন। যাতে করে সাধারণ মুসলমানরা দূরে সরে আসে। তিতুমীর এই আইন মেনে নিতে পারেননি, তিনি প্রথমে হিন্দু জমিদারদের চিঠির মাধ্যমে এই আইন উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলেন এবং তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের কথা বলেন। কিন্তু মাথা মোটা হিন্দু জমিদার তো বুঝলো না; বরং তারা কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। সাধরণ মুসলমানদের ওপর এমন জুলুমে তিতুমীর বসে থাকতে পারলেন না। গড়ে তোললেন প্রতিবাদী শক্তি। এই প্রতিবাদী শক্তি মানুষের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাই সাধারণ জনগণ দল-মত নির্বিশেষে সবাই তার সাথে যুক্ত হয়ে এক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই দাওয়াত অল্প সময়েই গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ কৃষক, মজুর ও নির্যাতিত মুসলমানরা তাঁকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের আন্দোলন ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম হয়ে ওঠে।

নীলকর সাহেবরা জোর করে নীল চাষ করাত, জমিদাররা বাড়তি খাজনা আদায় করতো, আর মুসলমানদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন চালাত। তিতুমীর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তিনি ঘোষণা করেন, "আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না।" এতেই ইংরেজ শাসক ও তাদের দোসর জমিদাররা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তিনি একে একে গোবরার জমিদার-দেবনাথ রায়, নাগপুরের জমিদার-গৌড় প্রসাদ চৌধুরী, তারাকান্দির জমিদার-রাজনারায়ণ ও গোবরডাঙার জমিদার-কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি জমিদারদের পরাজিত করেন। তিনি বিজয়ী এলাকা জুড়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তিতুমীর যখন এভাবে একে একে অত্যাচারিত জমিদারদের পরাজিত করতে থাকলেন তখন স্থানীয় সকল লোকজন জাত ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তিতুমীরের সাথে যোগ দেয়। তিনি চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, যশোর, ফরিদপুর ও কলকাতার উত্তর-পূর্ব সমগ্র অঞ্চল তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং সেখানে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি সেটাকে "বাঙালা আমিরাত" নামকরণ করেন। সেখানে তিনি শরিয়াহ আইন প্রণয়নের ঘোষণা দেন। সেখানকার জনগণের কড় অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ইংরেজ সরকারকে কড় দিতে অস্বীকার জানায়। তিতুমীর বাঙালা আমিরাতের সুলতান হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করার পাশাপাশি মুঈনুদ্দীন নামক এক আলেমকে প্রধানমন্ত্রী করেন এবং নিজের ভাগ্নে গোলাম মাসুমকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। তিতুমীরের এসব বিদ্রোহ ইতিহাসে "বারাসাতের বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। তিতুমীরের এসব দেখে ব্রিটিশরা পশ্চিমবঙ্গের ম্যাজেস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠান তিতুমীরকে গ্রেফতার করতে। নীলকুঠিতে দুই জমিদার ও ব্রিটিশ সম্বিলীত মিত্র বাহিনীর সাথে ১৮৩০ সালে তিতুমীরের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়। এই তিন মিত্র বাহিনী তিতুমীর বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

বাঁশের কেল্লা নির্মাণ ও যুদ্ধ-বিদ্রোহঃ সরফরাচপুরের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীর বাহিনীকে জুম্মার সালাতের সময় অতর্কিত হামলা করে। সেখানে দু'জন মুসলিম সেনা নিহত হয়। পরে কৃষ্ণদেবকে দাওয়া করলে সে পালিয়ে যায়। অর্তকিত হামলা থেকে বাঁচতে তিতুমীর তার বাহিনীকে নিয়ে ১৮৩১ সালের ২৭ অক্টোবর নারকেলবাড়িয়ায় ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। যা ইতিহাসে আজও কিংবদন্তি। এই বাঁশের কেল্লা ছিল নিপীড়িত মুসলমানদের আশ্রয় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক, ঈমানী দৃঢ়তার এক জীবন্ত নিদর্শন।

এদিকে প্রথমবার সফল হয়ে কৃষ্ণদেব রায় আবার হামলা করার পরিকল্পনা করে। ২৯ অক্টোবর সে বাঁশের কেল্লায় আক্রমণ করে। এই আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর অনেকে আহত হয়। ৬ নভেম্বর আবার আক্রমণ করে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর কৃষ্ণদের নীলকুঠির ব্রিটিশ ম্যানেজার ডিবিসের সাহায্যে ভারি অস্ত্র কামান নিয়ে আক্রমণ চালায়। এবার তিতুমীর প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। সেই যুদ্ধে কাপুরুষ কৃষ্ণদেব নিহত হয় ও ডিবিস তার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে যায়। জয়ধ্বনি ওঠে নারকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লায়। এর কিছুদিনের মধ্যে জমিদার দেবনাথ আক্রমণ

করে। সেও পরাজিত ও নিহত হয়। বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজেস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ১৩ নভেম্বর ১৮৩১ সালে আরেক দফা আক্রমণ হয়। সে যুদ্ধে আলেকজান্ডার কোনো রকম প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে।

এই যুদ্ধে বন্দি হয় আনেক ব্রিটিশ দারোগা। তিতুমীর তখন হয়ে ওঠেন ব্রিটিশদের "MOTE WANTED PERSON" ব্রিটিশদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয় তিতুমীর।

যে কোনো মূল্যে তিতুমীরকে দমন করার জন্য বদ্ধ পরিকল্পনা করতে থাকে ব্রিটিশ বেনিয়ারা। সে বছর ১৯ নভেম্বর ব্রিটিশ গর্ভনর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক নারকেলবাড়িয়ার হামলার নীল নকশা তৈরি করে। এই নকশা বাস্তবায়নের জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অন্যতম চৌকস অফিসার কর্নেল স্টোয়াডকে এক লাখকের আধিক সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তারা ভারি অস্ত্র কামান-বারুত নিয়ে তিতুমীরের সাধারণ কৃষক-শ্রমিক জনতার সৈন্যদের ওপর তীব্র আক্রমণ চলায়। তিতুমীর তার বাহিনীকে এই বলে উৎসাহিত করে যে, জিতলে তারা পাবে ইসলামী রাষ্ট্র ও হারলে বা নিহত হলে পাবে জান্নাত।

তিতুমীরের এই কথায় উজ্জীবিত হয়ে বাঙালা আমিরাতের সেনাবাহিনী তাদের লাঠি-সোঠা ও স্বল্প বন্দুক-গুলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর।

ব্রিটিশদের ভারি অস্ত্রের সামনে বেশিক্ষণ রুখে দাঁড়াতে পারিনি তারা। কামান-বারুতের আঘাতে ভেঙে পড়ে ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা। জীবনপ্রাণ শক্তির লড়াইয়ে তিতুমীরসহ শেষ পর্যন্ত বহু সেনা নিহত হয়। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুমসহ আরো অনেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। উইলিয়াম হান্টারের মতে, সেই যুদ্ধে তিতুমীরের সাথে ৮৩ হাজার কৃষক-শ্রমিক জনতারা যুদ্ধ করছিল।

তিতুমীর এই বীরত্বের লড়াই ভারতবর্ষের আজাদী আন্দোলনকে আরো সুতীব্র করে দেয়। আত্যাচারী ব্রিটিশরা তিতুমীরকে মারতে পারেনি; বরং বাংলা ও ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বোপন করে দেয়। এই শাহাদাত কোনো পরাজয় ছিল না। এটি ছিল বাংলার মাটিতে তাওহীদের রক্তিম স্বাক্ষর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম আত্মমর্যাদার ঘোষণা ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য এক অমর প্রেরণা। এজন্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একজন মানুষ মরলে আন্দোলন থামে না; বরং তার রক্তে আন্দোলন লেখা হয়। তিতুমীর পরাজিত হননি। তিনি প্রমাণ করে গেছেন, একজন সাধারণ মানুষও যদি মহান আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর জন্য জীবনপণ দিয়ে সংগ্রাম করে, তবে সাম্রাজ্যও কাঁপে ও ক্ষমতায় নড়বর হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব: ইতিহাসবিদ আর. সি. মজুমদার তিতুমীরের আন্দোলনকে বাংলার প্রথম সংগঠিত মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন।[১]

এই আন্দোলন কেবল সামরিক সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক ন্যায় ও আত্মমর্যাদার সমন্বিত রূপ ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনীর অভিযানে তিতুমীর শাহাদাত বরণ করেন, কিন্তু তাঁর আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে মুসলমান সমাজের আত্মপরিচয় ও প্রতিরোধচেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকে।[২]

এছাড়া তিতুমীরের সম্মানর্থের ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কলেজের নাম পরিবর্তন করে রাখো হয় সরকারি তিতুমীর কলেজ। বুয়েটে (বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়) তার নামে একটি ছাত্র হলের নামকরণ করা হয়, "তিতুমীর হল"। বিসিবি জরিপে তিনি ১১তম শ্রেষ্ঠ বাঙালি। খুলনায় রূপসা নদীর তীরে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি খাঁটি কমিশন তৈরি হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি জাহাজের নাম- বিএনএস তিতুমীর।

রাজশাহী ও নীলফারী জেলায় "তিতুমীর এক্সপ্রেস" নামে ট্রেন চলাচল করে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ২৪ পরগনার বারাসাত শহরের চাপাডালি মোড়ে শহরের মূল বাসস্ট্যান্ডকে "তিতুমীর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল" করা হয়েছে।

উপসংহার: তিতুমীর আজও জীবিত, শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়; বরং প্রতিটি মজলুমের বুকের ভেতর। যতদিন অন্যায় থাকবে, যতদিন তাওহীদের ডাক থাকবে, ততদিন বিদ্রোহের মতো উচ্চারিত হবে। তিতুমীরের জীবন প্রমাণ করে, কামান দিয়ে বাঁশ কেল্লা ভাঙা যায়, কিন্তু ঈমান দৃঢ় কেল্লা ভাঙা যায় না। ইতিহাস বদলাতে রাজসিংহাসন লাগে না, লাগে দৃঢ় বিশ্বাস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস। তিনি আজও বাংলার ইতিহাসে জীবিত, প্রতিটি আত্মমর্যাদাসচেতন হৃদয়ের ভেতর।

---

[১] *সূত্র: History of the Freedom Movement in India- R. C. Majumdar, Vol. I, pp. 312–314।*

[২] *সূত্র: The Annals of Rural Bengal- W. W. Hunter, Vol. II, pp. 180–187; বাংলাপিডিয়া- "তিতুমীর", ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫১; History of the Freedom Movement in India- R. C. Majumdar, Vol. I, pp. 312–314।*

قصص القرآن / ক্বাসাসুল কুরআন

মৃতকে জীবিত করার ঘটনা

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার জন্য বিন্দুমাত্র কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা যে তা করবেন বলেছেন, বিষয়টি বিশ্বাস করার জন্য কেবল এটাই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের যেন তা বিশ্বাস করতে আরো সহজ হয় এবং যেন মু'মিনদের অন্তরে আরো দৃঢ়তা আসে, এজন্য মানব ইতিহাসে বেশ কয়েকবার আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে তা করেও দেখিয়েছেন তেমনি একটি ঘটনা নিম্নরূপ:

এক এলাকার সমস্ত বাসিন্দা মারা গিয়েছিল, সেখানকার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে ধুলোয় মিশে গিয়েছিল। অর্থাৎ- এলাকাটি বিরানভূমি হয়ে গিয়েছিল। এক ব্যক্তি গাধায় চড়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। বসতির এমন বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে তিনি ভাবলেন, এই ধুলোয় মিশে যাওয়া নগরী, এটাকে আল্লাহ কীভাবে আবার আবাদ করবেন? এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ, যাদের হাড্ডি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আল্লাহ কিয়ামতের সময় এদেরকে কীভাবে পুনরায় জীবিত করবেন! তাঁর এ চিন্তা কোনো ধরনের সন্দেহের কারণে ছিল না; বরং এটা ছিল তাঁর বিস্ময় প্রকাশ।

আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে স্বচক্ষে দেখাতে চাইলেন, কীভাবে তিনি পুনরায় জীবন দান করতে পারেন। তাতে এ ঘটনা সকলের জন্য একটি দৃষ্টান্তও হবে এবং এর দ্বারা মানুষ হেদায়েতপ্রাপ্তও হবে। আল্লাহ তখন ওই ব্যক্তিকে মৃত্যু দান করলেন। সে অবস্থায় প্রায় একশত বছর কাটল। তারপরে আল্লাহ তাকে আবার জীবন দান করলেন এবং তাকে জীজ্ঞেস করলেন, এই মৃত অবস্থায় তুমি কতদিন ছিলে?

ওই ব্যক্তি বললেন, মনে হয় এক দিন বা এক দিনেরও কম সময়।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি তো এ অবস্থায় একশ বছর ছিলে। তোমার খাদ্যসামগ্রীর দিকে তাকাও, এগুলো দ্রুত পচনশীল, অথচ একশত বছর পরে এখনো কেমন তরতাজা আছে। আর তোমার গাধাটাকে দেখো, সেটা মরে পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! এবার দেখো, তোমার গাধাটাকে আমি কীভাবে আবার জীবিত করে তুলি।

তারপরে আল্লাহ তা'আলা তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গাধাটাকে আগের মতো জীবিত করে দেখালেন।

এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে ওই ব্যক্তি বলে উঠলেন, আল্লাহ! আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। আপনি মহান!

আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি এ ঘটনা এজন্য ঘটিয়েছি যে, তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য আমার কুদরতের একটি নিদর্শন বানাতে চাই। কুরআন কারীমে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"অথবা ঐ ব্যক্তির মতো যে কোনো জনপদ অতিক্রম করছিল যা থুবড়ে পড়ে আছে। সে বলল, এই নগর মৃত্যুর পর আল্লাহ কিভাবে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে এক শত বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে জীবিত করলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ অবস্থায় কতদিন ছিলে? সে বলল, একদিন অথবা একদিনের কিছু সময়। আল্লাহ বললেন, বরং তুমি একশত বছর অতিবাহিত করেছ। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য করে দেখো তা বিকৃত হয়নি, তোমার গাধার দিকেও লক্ষ্য করো। আমি তো তোমাকে মানুষের নিদর্শন করতে চাই আর তুমি হাড়গুলোর দিকে তাকাও কিভাবে আমি সেটাকে সংযুক্ত করি, তারপর সেটাকে গোশ্‌ত দ্বারা আবৃত করি। যখন তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল তখন সে বলল, আমি জানি আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।"[১]

এ ঘটনাটি কোথায়, কার সঙ্গে ঘটেছিল, কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে সেসব বর্ণিত হয়নি। ইতিহাসবিদগণ বলেন, বানী ইস্‌রা-ঈলের যুগে বুখতে নসরের আক্রমণে যখন জেরুজালেম নগরী ধ্বংস হয়ে যায়, তার পরে উযায়ের ( ) সে ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুজালেমে গিয়েছিলেন। তখন তার সঙ্গেই এ ঘটনা ঘটেছিল। আবার অনেকে বলেন, এ ঘটনা আরমিয়া ( )-এর সঙ্গে ঘটেছিল। এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরো অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে। সেগুলো বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়।[২]

---

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৯।*

[২] *তাফসীরে তবারী ও তাফসীরে ইবনু কাসীর- সূরা আল-বাক্বারাহ'র ২৫৯ নং আয়াতের তাফসীর; আলকামিল ফিততারীখ- ১/২০৪-২০৫; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া- ২/৩৮৪-৩৮৬; সিওহারবী- কাসাসুল কুরআন, ১/৫৯৭-৬০২।*

رَأْيٌ / অভিমত

রাগের ক্ষতি, রাগ নিয়ন্ত্রণের সুফল ও উপায়সমূহ

হোসাইন মঈন*

মানুষের রক্ত-মাংস-শিরা-উপশিরায় বয়ে চলা আবেগ নামক অদৃশ্য স্রোতের মধ্যে নিহিত একটি উত্তপ্ত উপাদান এবং একটি তীব্র মানসিক ও শারীরিক অস্বাভাবিক অবস্থার নাম হচ্ছে রাগ। অর্থাৎ- কোনো আঘাত, হতাশা, ভয় কিংবা অস্থিরতা, মানসিক চাপ, কোনো অবিচার বা অন্যায়, ভুল বোঝাবুঝি, হুমকি কিংবা অনুভূতিতে আঘাত লাগার কারণে মানুষের মধ্যে টিকে থাকা বা রুখে দেওয়া বা প্রতিশোধ নেবার প্রবণতায় যে শক্তিশালী, উত্তেজনা ও অস্বস্তিকর অসহযোগী প্রতিক্রিয়া বা তোলপাড় সৃষ্টি হয় তাকে রাগ বলে। রাগের অপর নাম হচ্ছে ক্ষোভ, ক্রোধ, আক্রোশ, কোপ বা রোষ। মানুষের নফ্সের মধ্যে মারাত্মক ক্ষতিকারক রিপুগুলোর মধ্যে অন্যতম রিপু এবং মানুষের অভ্যন্তরে পাপ কাজের দ্বার উন্মোচনকারী শয়তানের প্রবেশদ্বার হিসেবে গণ্য ও আখ্যায়িত করা হয়েছে রাগকে।

আবার মানুষ রাগ বা ক্রোধহীন হবে এমনটাও নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের ভেতরে রাগ কিংবা ক্রোধ থাকাটা যেমন আবশ্যক; তেমনি তা একটি ইতিবাচক ও প্রশংসিত বিষয় বা ইহসান শ্রেণির গুণও বটে। (যখন তা পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে, যখন তা নানা অনৈতিক অশালীন ও অশোভনতার বিরুদ্ধে নিজের ভেতরে সংঘটিত হয়; যখন তা মহান আল্লাহর জন্য হবে, ইসলামি শরিয়তের নীতি অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ- যে রাগসমূহ অশুভ, অকল্যাণ, অসত্য ও অশালীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর; অপকর্ম, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার; পারিবারিক কিংবা সামাজিক উশৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতা দূর করার জন্য সুসংগঠিত ও সুসংহত ব্যবস্থা গ্রহণ করার; সংস্কারের পন্থা, মানুষ বা সমাজকে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ঘটে।) কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের পন্থা বা সমাজকে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রক্ষার হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচিত হয় রাগ। শুধু তাই নয়, কারো মধ্যে রাগ বা ক্রোধ না থাকাটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, ভীরুতার লক্ষণ হিসেবেও বিবেচিত হয় কখনো কখনো। এক হাদীসে পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শনও বলা হয়েছে রাগকে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসবে মহান আল্লাহর জন্য, কারো সঙ্গে রাগ করবে মহান আল্লাহর জন্য, কাউকে কিছু দেবে মহান আল্লাহর জন্য, আর কাউকে দেবে না মহান আল্লাহর জন্য, এমন ব্যক্তি নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করলো।'[১]

কিন্তু তারপরও ইসলাম হারাম করেছে মানুষের রাগসমূহকে এবং ক্রোধ সংযম করে চলার প্রতি উৎসাহিত করেছে সকলকে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা রাগকে স্বাভাবিক ও যথার্থভাবে ব্যবহার না করে বিস্ফোরিতভাবে, অনুপযুক্ত উপায়ে পরিচালনা করে থাকি। ফলে তা আত্মআস্ফালনের শামিল হয়ে দাঁড়ায়। স্বভাবগত দিক থেকে তখন তা নিজের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনে; নিজেকে সমাজের কাছে মূল্যহীন করে তুলে, নিজেদের জীবনকে দুর্বিষহ করে ফেলে; জীবনের জন্য অনেক বড় হুমকি, ক্ষতি ও নানামুখী বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। কারণ অস্বাভাবিক, অনিয়ন্ত্রিত বা অনুপযুক্ত রাগ একদিকে যেমন মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক জীবনের মহা বিপত্তিকর বিষবৃক্ষ; তেমনি তা আত্মা, ঈমান ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রাণঘাতী টক্সিনের নামান্তর। অর্থাৎ- মাত্রাতিরিক্ত ও নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ বা রাগ, তর্ক, মারামারি এবং আক্রমণ বরাবরই মানুষের জন্য অনেক বড় হুমকি ও আত্মক্ষতির কারণ; এটি মানুষকে পদে পদে এতটা বিপদে ফেলে যে, পরবর্তী সময়ে এর জন্য চরম মাশুল গুনতে হয়। খোলাসা করে বললে– রাগ বা ক্রোধ মানুষের অন্য যে-কোনো আবেগের তুলনায় সম্পর্কের জটিলতাগুলোকে এতটা ভয়ংকর করে তুলে যে, একজন ব্যক্তি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অর্থাৎ- বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী-পরিজনসহ অনেকের কাছে অপছন্দের ও বিরক্তিকর মানুষে পরিণত হন। সবাই এমন মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে, পলায়ন করে, এড়িয়ে চলে, বর্জন করে তার আশপাশ। ফলে সে কখনো মানুষের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা লাভ করতে পারে না, বঞ্চিত হয় মানুষের সু-দৃষ্টি হতে। সব সময় মানুষের নিকট সে ঘৃণিত পাত্রে পরিণত হয়ে থাকে। ফলে তার জীবনের আনন্দটাই ম্লান হয়ে যায়, মানুষের সাথে তার সম্পর্কে তৈরি হয় স্থায়ী ক্ষত। এমনও হয় যে, অনেক সময় রাষ্ট্রীয় কিংবা শারীরিকভাবে হেনস্থার শিকার তো হতে হয়-ই; সম্পদ, সম্মান ও আর্থিকভাবেও হতে হয় ক্ষতিগ্রস্থ।

একটি গল্প বলা যাক– একবার এক বিষধর সাপ এক বাড়ির আঙিনার একপাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছিল। চলার পথে হঠাৎ একটি তরবারির ধারালো অংশের সাথে তার শরীর লেগে যায়। ব্যথা পেয়ে কুকড়ে ওঠে সে। এবং

---

* *লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, ছাপড়া মসজিদ রোড, আদি টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল-১৯০০।*

[১] *সুনান আবূ দাঊদ- ৪৬৮১।*

সে ক্ষেপে গিয়ে তরবারিকে আঘাত করে, তাতে আবারও ব্যথা পায়, শরীরের খানিকটা কেটেও যায় তার। সে আরো ক্ষেপে গিয়ে তরবারিটিকে শত্রু মনে করে নিজের শরীর দিয়ে শক্ত করে পেচিয়ে ধরতে যায়। আর অমনি তরবারির ধারালো আঘাতে দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মারা গেল সে। অর্থাৎ- রাগ নির্ভুলভাবে বুদ্ধি প্রয়োগেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; কেননা শয়তান তখন (রাগ নামক) এ পথে প্রবেশ করে মানুষের নফসকে রিপু দ্বারা এমনভাবে সংক্রমিত করে এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে এমনভাবে খেলা করতে শুরু করে যে, নফস তখন রিপুর প্ররোচণা সংবরণ কিংবা সংযত করতে পারে না, বিবেক তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষের মেজাজ বা মানসতন্ত্রীতে ক্রোধ তখন দাবানলের জ্বলন্ত অগ্নির মতো দাউ দাউ করে জেগে উঠে। মানুষ তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং দিশেহারা হয়ে সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যকে ভেঙে দিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অমানবিকতা সৃষ্টি করে বসে। আর এটা যখন প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পায় তখন তা কোপানল বা রোষানলে পরিণত হয়। আর রোষানলের উদ্ভূত ফল যে কী পরিমাণ অরাজকতা ও চরম উগ্রতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা মোটামুটি কম-বেশি সকলেরই জানা। রোষানল এমন সব অঘটনের জন্ম দেয়, যা আদৌ কাম্য নয়।

সমাজ কিংবা পারিপার্শ্বে তাকালে চারিদিকে শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত সমীকরণ চোখে পড়ে। হয় তারা একে-অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের অনলে পুড়ছে, নয়তো একজন আরেকজনকে পাহাড়ের চেয়ে ভারী বলে ভাবছে; কিংবা একজন আরেকজনের সাথে দেখা করতে নারাজ, একসঙ্গে বসতে নারাজ, একসঙ্গে সফর করতে নারাজ; এমনকি কোনো অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যোগদান করতে নারাজ; একে-অন্যকে সহ্য করতে নারাজ। দেখা যায় সমাজে-সমাজে, পাড়ায়-পাড়ায়, পড়শি-প্রতিবেশীতে ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-কোন্দল, অরাজক অবস্থা সর্বদা বিরাজমান। আবার অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে শতকরা মৃত্যুহারের একটি ভালো অংশ দখল করে আছে আত্মহত্যা। আর এ সংখ্যা ক্রমহারে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে; বাড়ছে খুনাখুনি, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, বাড়ছে তালাক বা বৈবাহিক বিচ্ছেদ। আর এ সকল হেন কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষের ঔদ্ধত্তপূর্ণ মনোভাব বা রাগ বা ক্রোধ। বিশ্বব্যাপী কত পরিবার যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে রাগের কারণে তার ইয়ত্বা নেই। দেখা গেছে– যে পরিবারে বাবা-মায়ের মধ্যে রাগারাগি-ঝগড়াঝাটি প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে, সে পরিবারের সন্তান-সন্ততির অন্তরে এক ধরনের অশান্তি সঞ্চারিত হয়, যা তাদের এক দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। এই ধরনের পরিবারের মধ্যে যতই অর্থবৈভব থাকুক না কেন, রাগারাগি থাকার কারণে তাতে কোনো প্রকার সুখের পরিবেশ আনতে পারে না। বাবা-মায়ের মধ্যকার অশান্তি পারিবারিক ক্ষেত্রে এমন ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে, যা নিরসন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যে পরিবারের বাবা-মায়ের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা লেগেই থাকে সে পরিবারের ভিত এমন নড়বড়ে হয়ে যায় যে, সেই পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অপরিণত বয়সেই দোষ প্রবণতার শিকার হয়। তাদের বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই তারা বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে এবং অপরাধচক্রের খপ্পড়ে পড়ে; এমনকি একটা পর্যায়ে তারা বড় বড় অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজজীবনের জঞ্জালে পরিণত হয়।

আবার অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ বা রাগের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী শরীরবৃত্তীয় কুপ্রভাবও রয়েছে– যা শরীর, মন, মানসিকতা ও মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। টানা ছয় ঘণ্টা মন-মেজাজ খারাপ করে থাকলেই যেখানে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়; শরীরে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়; সেখানে নিয়মিত ও অতিরিক্ত রাগের প্রভাবে কী হতে/ঘটতে পারে তা খুব সহজেই অনুমেয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'রাগের সময় মানবদেহে কিছু জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যেমন- হার্টরেট, শ্বাস-প্রশ্বাস, দেহের তাপমাত্রা ও রক্তচাপের হার বেড়ে যাওয়া এবং পেশী সংকুচিত হয়ে আসা ইত্যাদি (এককথায় যেটাকে বলা হয় ফ্লাইট অর ফাইট রেসপন্স সক্রিয় হয়ে ওঠা)। দীর্ঘ সময় ধরে যদি এই রেসপন্স চলতে থাকে তাহলে অনেক ধরনের জটিল ও কঠিন যেমন- অ্যাজমা, আলসার, মৃগী রোগ, উদ্বেগ বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, রক্তের বায়ুচাপ, হজমের সমস্যা, ত্বকের সমস্যা, পেটে ব্যথা, অনিদ্রা, বিষণ্নতা, মাথাব্যথা, ভারসাম্যহীনতা, মাইগ্রেন, ব্যাকপেইন, ফুসফুসের অসুখ ইত্যাদি রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে হৃৎপিণ্ড।' অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, তীব্র রাগ হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতাকে বিপর্যস্ত করে। আবার ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকগণ একটি গবেষণা পরিচালনা করে দেখেছেন যে, যারা ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, রুষ্ট-তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে। অর্থাৎ- যারা স্থিরমতিসম্পন্ন নয়, যারা মার্জিত ও পরিশীলিত নয়, যাদের মধ্যে ক্রোধের ভয়াবহতা রয়েছে অর্থাৎ- যারা মাত্রাতিরিক্ত মেজাজী, তাদের ধমনীতে অন্যদের তুলনায় এত বেশি পরিমাণ/মাত্রায় ক্যালসিয়াম জমা এবং স্ট্রেস হরমোন তরঙ্গায়িত হয়, যা রক্তনালীর আবরণকে খুবই দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ করে; যা হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি ও হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম কারণ; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ক্রোধ বা রাগের বিস্ফোরণ হৃদরোগের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কারণও বটে। ইংল্যান্ডের সেন্ট জার্জেস হাসপাতালের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক ডা.

জন হান্টার-এর নাম শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই? রাগের বিস্ফোরণজনিত কারণে হৃদরোগে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছিল তার। চিকিৎসায় সুখ্যাতি থাকলেও অত্যন্ত বদমেজাজী ছিলেন তিনি। রোগিরা একটু অপ্রত্যাশিত আচরণ করলেই রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়তেন। একবার তার চেম্বারে খুব খুঁতখুঁতে মেজাজের একজন রোগী এলেন। তার কী রোগ হয়েছে? এ রোগ কেন হয়? –এরকম নানা প্রশ্ন করে তিনি ডা. জন হান্টারকে উত্যক্ত করে তুললেন। রোগীর এ-হেন আচরণে ডা. তার স্বভাব অনুযায়ী ক্রোধে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েন। তার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। রোগীর কাছ থেকে সড়ে গিয়ে পাশের রুমে যেতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। তার এই মৃত্যুর মূল কারণ ছিল ক্রোধের বিস্ফোরণ। অতিরিক্ত রাগে ব্রেইন স্ট্রোকের ঝুঁকিও বহুগুণে বেড়ে যায়। কেননা কারো ক্রোধ বা রাগ অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘস্থায়ী হলে তা মস্তিষ্কের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, এতে মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলো বন্ধ হয়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া মস্তিষ্কের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সম্পূর্ণ শরীরের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে, অতিরিক্ত ক্রোধ তার ওপর আঘাত হানে, ফলে শরীরের বিভিন্ন সিস্টেমের মারাত্মক ক্ষতি হয় বা হওয়ার সম্ভাবনার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

মোদ্দাকথা, রাগ বা ক্রোধ অন্তরের এমন এক দাবানল– যা পুড়িয়ে ফেলে দেহ-মন ও আত্মার স্বাস্থ্য, নষ্ট করে দেয় ‘আমলের সৌন্দর্য, গ্রাস করে নেয় আখিরাতের আশা। ক্রোধাবিষ্ট হয়ে মানুষ এমন কিছু করে ফেলে, যা অনেক ক্ষেত্রে ঈমান-‘আক্বিদাহ্ নষ্ট বা বরবাদ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনীষীগণ তাই বলেন, ‘ক্রোধ হন্তারক। যে ক্রোধ-রোগে আক্রান্ত– ক্রোধ তাকে মেরে ফেলে; ক্রোধ তাকে তার আগের অবস্থানের চেয়ে অনেকখানি নিচে ফেলে দেয়।’ সাফল্যের চরম অন্তরায় হিসেবে কাজ করে ক্রোধ। অর্থাৎ- মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণে জীবনে সাফল্যের মুখ দেখার সুযোগ-সম্ভাবনা কম থাকে বিদায় জীবন যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রেই হেরে যেতে হয় তাকে। কেননা ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ওপর সর্বদা মহান আল্লাহর গজব নেমে আসে।

যেহেতু রাগের মধ্যে শয়তানের প্রভাব রয়েছে এবং তা আমাদের অন্তরের বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয়: আমাদের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক তথা সর্বপ্রকার অকল্যাণ বা ক্ষতি ডেকে আনে; জীবনের সমূহ সমস্যা নিরসন কিংবা সাফল্যের পথের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে; অন্যের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ এবং তা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই বিপর্যস্ত করে দেয়, তাই রাগ সংবরণ করে চলাই হবে উত্তম কাজ। কারণ, ক্রোধের প্রভাবে মানুষের কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, লাগাম থাকে না মুখের কথায়। তখন কোনো দিক পরোয়া না করে, কোনো দিক বিবেচনা না করে, কোনো পরিণাম না ভেবে প্রায় সময়ই অসংযত বা বেফাঁস বা অসংলগ্ন কথা বলে ফেলি বা বলে ফেলতে পারি, যার জন্য সারাজীবন আমাদের লজ্জিত থাকতে হয়; এমন কিছু করে ফেলতে পারি যা অন্যের ওপর জুলুম হয়ে যায়, কোনো ফায়সালায় বে-ইনসাফ বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে; এমনও হতে পারে এজন্য আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের নামে অসন্তুষ্টি লিখে দেন। হুমাইদ ইবনু ‘আব্দুর রহমান (رحمه الله) কর্তৃক বর্ণিত, একজন সাহাবি নবী করিম (ﷺ)-এর কাছে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন। নবীজি (ﷺ) জবাবে বললেন, ‘রাগ কোরো না।’ (অর্থাৎ- রাগ করার স্বভাব বর্জন করো)। সাহাবি বলেন, ‘অতঃপর চিন্তা করতে লাগলাম, রাসূল (ﷺ) এমন উপদেশ আমাকে কেন দিলেন? পরে বুঝতে পারলাম বহু মন্দ কাজ রাগের মধ্যে রয়েছে।’[১] রাসূল (ﷺ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই ক্রোধ ঈমানকে বিনষ্ট করে, যেমন- সবির (সবির হচ্ছে এক জাতীয় তিক্ত ফল, যা অনেকটা মাকাল ফল বা মহাবেল-এর মতো) মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।’[২] তিনি আরো বলেছেন, ‘ক্রোধান্ধ ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ অবস্থায় নিজের অশোভনীয় বিকৃত আকৃতি দেখতে পেতো তাহলে লজ্জায় তখনি ক্ষান্ত হয়ে যেত।’[৩]

একবার এক মল্লযুদ্ধে ‘আলী (رضي الله عنه) শত্রুকে কুপোকাত করে ফেললে শত্রু তার মুখে থুথু দেয়। এতে ‘আলী((رضي الله عنه) ক্রোধান্বিত হন। কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হওয়া সত্ত্বেও শত্রুকে তিনি ছেড়ে দেন এই ভেবে যে, এখন শত্রুকে আঘাত হানার অর্থ হবে ব্যক্তিগত আক্রোশে তিনি শত্রু নিধন করছেন। এই ঘটনায় শিক্ষণীয় হচ্ছে– যে-কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মেজাজ শান্ত রেখে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করাটা হচ্ছে মার্জিত ও পরিশীলিত রুচির কাজ; আর মার্জিত মানুষের মধ্যে ক্রোধের ভয়াবহতা থাকতে পারে না। এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘কুস্তি করাতে কোনো বীরত্ব (প্রাবল্য) নেই; বরং প্রকৃত বীরত্ব নিহিত রয়েছে ক্রোধ সংযমে।’[৪] সূরা আ-লি-‘ইমরান: ১৮৬ ও ১৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং সাবধানতা অবলম্বন করো, তাহলে অবশ্যই সেটা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।” “আর তারাই মুত্তাকি, যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।” উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা‘আলা রাগ নিয়ন্ত্রণকারীকে ‘মুহসিন’ বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

অর্থাৎ- বোঝা যাচ্ছে যে, ক্রোধ সংযম মহান আল্লাহর গজব থেকে মানুষকে শুধু রক্ষাই করে না; বরং রাগ নিয়ন্ত্রণ ও নিজেকে সংবরণ করার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা প্রচুর কল্যাণ

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩৭৩।*
[২] *বায়হাক্বী।*
[৩] *বায়হাক্বী।*
[৪] *বুখারী- ৬১১৪; মুসলিম- ২৬০৯।*

রেখেছেন এবং ক্রোধ সংবরণকারীদের তিনি ভালোওবাসেন। অর্থাৎ- রাগ সংবরণকারী ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়ভাবেই পুরস্কৃত হন। রাসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে বলেছেন, 'ক্রুদ্ধ হইয়ো না, প্রতিদানে তোমার জন্য জান্নাত।' 'যে রাগ প্রতিফলনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর ঈমান ও নিরাপত্তা দিয়ে পূর্ণ করে দেন এবং সব সৃষ্টির সম্মুখে আহ্বান করে তাকে ইচ্ছেমতো জান্নাতের যে-কোনো হুর গ্রহণ করার অনুমতি দেবেন।'[১] বস্তুত রাগ নিয়ন্ত্রণকারীগণ সফল ও শক্তিশালী। মিশকাতে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বার হিফাজত করে, তার দোষত্রুটি আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখেন; আর যে ব্যক্তি রাগকে সংবরণ করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে আযাবকে দূরে রাখবেন।' 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এমন কি কাজ আছে যা আল্লাহ তা'আলার গজব থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে?' নবিজি (ﷺ) বললেন, তুমি রাগ কোরো না।'

কথা হচ্ছে রাগ আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো? ধর্মবোদ্ধাগণ এ বিষয়ে বলেন, 'রাগ নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে মুখ ও অন্তর দ্বারা মহান আল্লাহর যিক্‌র করা। কেননা ক্রোধ হলো শয়তানের কু-প্রভাবের বিষক্রিয়া। তাই যখন মানুষ মহান আল্লাহর যিক্‌র করে তখন শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়।' আল্লাহ তা'আলা বলেন, "জেনে রাখো, মহান আল্লাহর যিক্‌রই অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।"[২] ক্রোধ পরিত্যাগের আরো একটি উপায় হচ্ছে মানুষকে ক্ষমার সওয়াবের কথা স্মরণ করা; রাগের উত্তাপ নেভানোর সবচেয়ে সুন্দর পথ হলো ক্ষমা, ক্ষমাই শান্তির বীজ বপন করে মানুষের অন্তরে। পবিত্র কুরআনের সূরা আশ্-শূরা-: ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে এবং ক্রোধ প্রকাশের পরিবর্তে ক্ষমা করে দেয়, তারাই প্রকৃত ঈমানদার।" এছাড়া কারো মধ্যে রাগের উদ্রেক হলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থানের পরিবর্তন করলেও রাগ পড়ে যায়, কিংবা সঙ্গে সঙ্গে ওযূ করে নিলেও রাগ প্রশমিত হয়ে যায়। রাসূল(ﷺ) বলেছেন, 'রাগের সময় আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম'-এই দু'আটি পাঠ করলেও মন থেকে রাগ দূর হয়ে যায়।'[৩] বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দাঁড়ানো অবস্থায় রেগে যায়, সে যেন তখনই বসে পড়ে; তাতেও যদি তার রাগ প্রশমিত না হয় তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।'[৪] আরো একটি উপায় হচ্ছে কেউ যদি খুব বেশি রাগ বোধ করে, তাহলে মেজাজ ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে পরিস্থিতি থেকে তার দূরে চলে যাওয়া প্রয়োজন।

নিজের স্বভাব ও আচরণ থেকে রাগ নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণের আরো একটি উত্তম উপায় হচ্ছে সর্বদা হাসিমুখে থাকা, হাসার অভ্যাস করা। জীবনে যে যত বেশি হাসে, তার মধ্যে তত বেশি রাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তৈরি হয়। হাসি মানুষের ভেতরের নেতিবাচক চিন্তা আর আচরণকে দূরে হটিয়ে তাকে ইতিবাচক করে তোলে। সমাজে মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিবোধ সৃষ্টিতে মানুষের যে চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো অনবদ্য ভূমিকা রাখে, তন্মধ্যে হাসি হচ্ছে অন্যতম। রাগ যেখানে এক প্রকার ভাইরাসস্বরূপ, জীবন-সম্পদ-সম্মান এবং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ও মর্যাদা হ্রাস ও ভয়ানক বিপর্যয়ের কারণ; হাসি, আনন্দ, সন্তোষ ও স্নিগ্ধ মনের পরিচায়ক এবং মানুষের নানা বিপদ-বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মহৌষধ। কাজেই কৌতুক রসবোধ দ্বারা দমন করতে হবে ক্রোধকে।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'নিজের আবেগকে স্বাভাবিক ও জীবনের অংশ হিসেবে চিনতে ও গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত কারণে মানুষ ক্রুদ্ধ হয় প্রথম কাজ হবে সেগুলোর সঠিক কারণ খুঁজে বের করা। এজন্য রাগ বিস্ফোরণের একটি ডায়েরি রাখতে হবে। তাতে আপনি কীভাবে এবং কেন ক্ষিপ্ত হন তা লিপিবদ্ধ করে সে অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। যারা মানসিক চাপে থাকেন, তাদের রাগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই রাগ শিথিলকরণ কৌশলগুলো শেখাটা খুব জরুরি। ধ্যান বা যোগব্যায়াম হচ্ছে উত্তম কৌশল। বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা এটাই নথিভুক্ত করেছে যে, নিয়মিত ব্যায়াম মেজাজ উন্নত করতে পারে এবং চাপের মাত্রা কমাতে পারে। যত বেশি সম্ভব শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, শারীরিক পরিশ্রম মানসিক চাপের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে পুড়িয়ে দেয় এবং এটি মস্তিষ্কের মেজাজ-নিয়ন্ত্রক নিউরোট্রান্সমিটারের উৎপাদনকে বাড়িয়ে তোলে।' একজন মনোবিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তারা যেভাবে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়, সেইভাবে 'আমল-পালন করা উচিত। নিজেকে শান্ত ও প্রশান্ত রাখার উপায় যেমন শিখতে হবে, তেমনি সৎ যোগাযোগে হতে হবে উৎসাহী।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে অনন্য বৈশিষ্ট্যটি মানুষের ভেতরের রাগ বা ক্রোধকে দমিয়ে রাখতে পারে তা হচ্ছে বিনয়। তাই প্রতিনিয়ত আমাদের বিনয় বা নম্রতা

---

[১] *আবূ দাউদ- ৪৭৭৭, ৪৭৭৮; তিরমিযী- ২০২১; ইবনু মাজাহ্- ৪১৮৬।*
[২] *সূরা আর্-রা'দ: ২৮।*
[৩] *মুসলিম- ৬৩১৭।*
[৪] *তিরমিযী।*

অবলম্বনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। রাগ যেখানে ব্যক্তিকে কলুষিত করে, সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ায়, মানুষে মানুষে শত্রুতা সৃষ্টি করে; বিনয় সেখানে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করে। বিনয় এমন এক জিনিস, যা মানুষকে মহান আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করে তাঁর রহমতের অধিকারী বানায়; মানুষের জীবনকে করে তোলে পবিত্রময়। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর বান্দা তো হচ্ছে তারা, যারা জমিনে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অশালীন ভাষার বিপরীতে প্রশান্তভাবে জবাব দেয়।"

(সূরা আল-ফুরক্বা-ন: ৬৩)

অর্থাৎ- রাগ করে না। 'দুনিয়ার বুকে তারাই সেরা নেয়ামত পেয়ে গেছে, যারা বিনয়ী বা নম্রতার অধিকারী।'

(বুখারি- ৯; মুসলিম- ১৬১)

নম্র বা বিনয়ীরাই হচ্ছে সর্বোত্তম মুসলিম। নিশ্চয়ই আমরা সর্বোত্তম মুসলিম হতে চাই।

আর একটা কথা, রাগ নিয়ন্ত্রণের অনন্য উপায় যেমন বিনয়; তেমনি আবার মানুষকে বিনয়ী করে তোলে সালাম প্রদানের অভ্যাস। মানুষ সামাজিক জীব, সামাজিক বন্ধন ছাড়া তার বেঁচে থাকা মুশকিল। সমাজে এই বন্ধন সুদৃঢ় হয় যেহেতু পারস্পরিক আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার মাধ্যমে; আর সেটা সুসম্পন্ন হতে পারে সালামের আদান-প্রদান দ্বারা। তাই রোষের অনল কিংবা রাগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য পরিবার ও সমাজে ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন, প্রসার ঘটানো উচিত। রাসূল (ﷺ)-ও পারস্পরিক সালাম বিনিময়ের এ বিধানটিকে সমাজ-জীবনে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিশেষে কথা হচ্ছে, যেহেতু জীবন একটাই এবং সেটা আমারই। তাই সেটাকে সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার দায়িত্বও যেমন আমার; তেমনি আমার অনিয়ন্ত্রিত রাগের কারণে তা যদি ধ্বংসের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছায়, তবে সে দায়ভারও আমার। জীবনে সমস্যা ও চাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আবার আমার চারপাশ, রাস্তাঘাট, মানুষ, আত্মীয়পরিজন, নিয়মকানুন পরিস্থিতি সবকিছু আমার অনুকূল হবে, এমনও নয়। অন্যের অসভ্যতা দেখে নিজেও অসভ্য হয়ে যাওয়া মানে সমাজ তথা গোটা পৃথিবীটাকে আরো খারাপের দিকে ঠেলে দেওয়া। মূলত নানা বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও যে মানুষ নিজেকে শান্ত রাখতে পারে, কম স্বার্থপর ও একটু বেশি মানবিক হতে পারে, একটু বেশি ধৈর্য ও সহানুভূতিশীল হতে পারে, দিন শেষে সে মানুষই সবচেয়ে বেশি হাসিখুশি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাগ সংযম, বিনয় অবলম্বন ও সালাম বিনিময় করে চলার তাওফীক্ব দান করুন —আমীন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত **"মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ"**-এর বালিকা শাখার জন্য শূণ্য পদে ১জন শিক্ষিকা এবং ৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দেওয়া হবে।

ক্রঃ	পদ	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পাঠদানের স্তর	অভিজ্ঞতা
১	সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা (আরবি)	০১	দাওরা হাদীস/মাস্টার্স	কুল্লিয়া স্তরে পাঠ দানে সক্ষম	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনকারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২	সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা (আরবি)	০১	দাওরা হাদীস/ সমমান	উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ দানে সক্ষম	অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৩	সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা (আরবি)	০১	দাওরা হাদীস/ সমমান	মাধ্যমিক স্তরে পাঠ দানে সক্ষম	অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৪	সহকারী শিক্ষিকা (ইংরেজি)	০১	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নূন্যতম স্নাতক (সম্মান)/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	মাধ্যমিক স্তরে পাঠ দানে সক্ষম	অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ২৯ আগষ্ট ২০২৬ রোজ: শনিবার, সকাল: ১০ ঘটিকায় মাদ্‌রাসার অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য আহবান করা হলো।

প্রয়োজনে:
০১৯২৭৮০২৮০৮

সাধারণ সম্পাদক
মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ
পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

القضايا العالمية / আন্তর্জাতিক

ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি

সংকলনে– মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা*

ইসলামের চিরন্তন ইতিহাসে মধ্যপ্রাচ্য যেমন কেন্দ্রবিন্দু, তেমন ইরান বা প্রাচীন পারস্য এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আরব বিশ্বে ইসলামের বিস্তার এবং ইরান শিয়া রাষ্ট্রে রূপান্তরের ইতিহাস অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট।

১. পারস্য বিজয় ও ইসলামের আগমন (৬৩৩-৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ): রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও খলিফা ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র শাসনামলে মুসলিম খিলাফতের সম্প্রসারণ এবং পারস্যের অগ্নিপূজক সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ (৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ): এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ঐতিহাসিক বিজয়ের ফলে পারস্যে সাসানীয় শাসনের ভিত্তি ভেঙে পড়ে।[১]

নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ (৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ): এর মাধ্যমে পারস্যের কেন্দ্রীয় শাসনের সম্পূর্ণ পতন ঘটে এবং সমগ্র ইরান অঞ্চল ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়।[২]

২. শু’উবিয়া আন্দোলন এবং ফার্সি ভাষার টিকে থাকা (৮ম-৯ম শতাব্দী): ‘উমাইয়াহ্ খিলাফতের পরবর্তী সময়ে এবং ‘আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনালগ্নে অ-আরব মুসলিমদের (বিশেষ করে ইরানিদের) মধ্যে একটি অংশ তাদের প্রাচীন পারস্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য ‘শু’উবিয়া’ নামক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে।

ভাষা রক্ষা: মিশরের কিবতি বা সিরিয়ার আরামাইক ভাষার মতো ইরানিরা সম্পূর্ণ আরবীকরণ (Arabization)-এর মধ্য দিয়ে যায়নি। তারা ইসলাম গ্রহণ করলেও নিজেদের মাতৃভাষা ‘ফার্সি’ এবং নিজস্ব কৃষ্টি ধরে রাখে।[৩]

প্রশাসনিক প্রভাব: ‘আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর পারস্যের বার্মাকি পরিবারের রাজনৈতিক উত্থান ঘটে এবং খিলাফতের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে পারস্যের রীতিনীতির বড় প্রভাব তৈরি হয়।[৪]

৩. ইসলামের স্বর্ণযুগে এই অঞ্চলের গবেষকদের অবদান (৯ম-১২শ শতাব্দী): ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্র (হাদীস) সংকলনে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার জ্ঞানমনীষীদের অবদান ঐতিহাসিকভাবে অনস্বীকার্য।

বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন: ইসলামের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভিত্তি হলো কুরআন ও সহীহ হাদীস। ইসলামের প্রধান ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের (সিহাহ সিততাহ) প্রায় সকল সংকলক– যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ্, ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসায়ী –সকলেই পারস্য বা মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক বলয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তারা আরবের বাইরে থেকে এসেও ইসলামের মূল ধারাকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করেছেন।[৫]

৪. ইরানি জাতির শিয়া মতাদর্শে রূপান্তরের ইতিহাস (১৫০১ খ্রিষ্টাব্দ): ১৬শ শতাব্দীর আগে ইরান অঞ্চলটি মূলত সুন্নিপ্রধান (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত) ছিল। ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে সফাভি রাজবংশের (Safavid Dynasty) উত্থানের মাধ্যমে ইরানিরা রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের মুখে শিয়া মতবাদের অনুসারী হয়।

---

*সাবেক সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান, আহলে হাদীস লাইব্রেরি, ঢাকা এবং পরিচালক, উসওয়া পাবলিকেশন্স।

[১] আল-তাবারী, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনু জারির। *তারিখ আল-রাসূল ওয়া আল-মুলুক (The History of al-Tabari)*, খণ্ড ১২, পৃ. ১৪১-১৪৫। অনুবাদক: খলিদ ইয়াহিয়া বাংলাঙ্কিনশিপ, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS (SUNY Press), আলবানী, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৯।

[২] হিট্টি, ফিলিপ কে.। *হিস্ট্রি অব দ্য আরবস (History of the Arabs)*, ১০ম সংস্করণ, পৃ. ১৫৭। ম্যাকমিলান এডুকেশন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ২০০২।

[৩] গোল্ডজিহের, ইগনাজ। *মুসলিম স্টাডিজ (Muslim Studies)*, খণ্ড: ১, পৃ. ১৩৭-১৬৩। সম্পাদক: এস. এম. স্টার্ন, অ্যালডিন ট্রানজেকশন, শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৬।

[৪] হডসন, মার্শাল জি. এস.। *দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম (The Venture of Islam)*, খণ্ড: ১, পৃ. ২৮৪-২৯২। দ্য ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৭।

[৫] ব্রাউন, জোনাথন। *হাদীস: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য মেথডোলজি অ্যান্ড হিস্ট্রি অব প্রফেটিক ট্রাডিশনস (Hadith: An Introduction)*, পৃ. ৮১-৮৫। ওয়ানওয়ার্ল্ড পাবলিকেশন্স, অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য, ২০০৯।

শাহ ইসমাইলের রাজনৈতিক কৌশল: শাহ ইসমাঈল সফাভি ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের ক্ষমতা দখল করে দ্বাদশী (Twelver) শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে। যারা পূর্ববর্তী বিশ্বাস ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের ওপর তীব্র নির্যাতন চালানো হয়।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব: এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। পশ্চিমে শক্তিশালী সুন্নি উসমানীয় সাম্রাজ্যের (Ottoman Empire) হাত থেকে ইরানের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করার জন্য শাহ ইসমাঈল শিয়া মতবাদকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার বা প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।[১]

আলেমদের আমদানি: তৎকালীন ইরানে শিয়া তত্ত্বের প্রচারক না থাকায়, সফাভি শাসকেরা বর্তমান লেবানন (জাবাল আমিল), বাহরাইন এবং ইরাকের কারবালা থেকে শিয়া আলেমদের নিয়ে আসেন। তারা দেশজুড়ে মাদ্‌রাসার নেটওয়ার্ক তৈরি করে সুন্নিপ্রধান ইরানি জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিয়া বিশ্বাসে দীক্ষিত করে।[২]

৫. ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লব ও বর্তমান আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য: বিংশ শতাব্দীতে এসে পশ্চিমা সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষ পাহলভি রাজবংশের (শাহ শাসন) দুর্নীতির বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে একটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, যা 'ইসলামিক বিপ্লব' নামে পরিচিত।

বেলায়েত-এ-ফকিহ: খোমেনী শিয়া রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী 'ইসলামী আইনজ্ঞের অভিভাবকত্ব' বা বেলায়েত-এ-ফকিহ তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি নতুন শাসনতান্ত্রিক মডেল তৈরি করেন, যেখানে ধর্মীয় স্কলারদের হাতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।[৩]

আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব: এই বিপ্লবের পর ইরান তার নিজস্ব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে সুন্নিপ্রধান দেশগুলোর (যেমন- সৌদি আরব) সাথে ইরানের রাজনৈতিক ও কৌশলগত দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা বর্তমান ইয়েমেন, সিরিয়া ও লেবাননের সংকটে স্পষ্ট।[৪]

পরিশেষে– ঐতিহাসিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম সুন্নি ধারা ও খিলাফতের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছিল এবং ইরানও দীর্ঘকাল এই মূলধারার অংশ ছিল। তবে ১৬শ শতাব্দীতে সফাভি রাজবংশের রাজনৈতিক ও কৌশলগত সিদ্ধান্তের কারণে ইরান সুন্নি ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র শিয়া রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং ধর্মীয় মেরুকরণ মূলত ইসলামের এই প্রধান দু'টি ধারার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দূরত্বেরই আধুনিক রূপ।

ইতিহাস কেবল অতীতের গল্প নয়; বরং বর্তমানকে গভীরভাবে বোঝার দর্পণ। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণগুলোর মূল শিকড় যে কতটা গভীরে প্রোথিত, তা এই ঐতিহাসিক রূপান্তরের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন সচেতন পাঠক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো– যেকোনো সমসাময়িক ঘটনাকে কেবল উপযুক্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, তার পেছনের সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে অনুসন্ধান করা। আসুন, আমরা হুজুগ বা খণ্ডিত তথ্যের পেছনে না ছুটে, ইতিহাসের বিশুদ্ধ উৎস থেকে জ্ঞানার্জন করি এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলি।

---

[১] *সেভরি, রজার। ইরান আন্ডার দ্য সাফাবিডস (Iran Under the Safavids), পৃ. ২৭-৩৫। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ, যুক্তরাজ্য, ১৯৮০।*

[২] *আরজোমান্দ, সাইদ আমির। দ্য শ্যাডো অব গড অ্যান্ড দ্য হিডেন ইমাম (The Shadow of God and the Hidden Imam), পৃ. ১০৫-১২২। দ্য ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৮৪।*

[৩] *খোমেনী, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ। ইসলামিক গভর্নমেন্ট: গভর্ন্যান্স অব দ্য জুরিস্ট (Islamic Government), পৃ. ২৯-৫২। ইনস্টিটিউট ফর কমপ্লিশন অ্যান্ড পাবলিকেশন অব ইমাম খোমেনীস ওয়ার্কস, তেহরান, ইরান, ২০০০।*

[৪] *নাসর, ভালি। দ্য শিয়া রিভাইভাল: হাউ কনফ্লিক্টস উইদিন ইসলাম উইল শেপ দ্য ফিউচার (The Shia Revival), পৃ. ১১৫-১৩১। ডব্লিউ. ডব্লিউ. নর্টন অ্যান্ড কোম্পানি, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৬।*

صَفْحَةُ الشُّبَّانِ / শুব্বান পাতা

জাগ্রত যুবসমাজ

ইমরান বিন শামসুদ্দিন★

পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিটি জাগরণ, প্রতিটি বিপ্লব এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিটি সমস্যা দূরীকরণে এবং প্রতিটি সফলতার পিছনে রয়েছে এক ঝাক তরুণ সমাজ। আত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি সেক্টরে রয়েছে তাদের কীর্তি। অদম্য সাহস, দুর্ভার উদ্দীপনা, মনুষ্যত্ব, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতাই তাদের একমাত্র সম্বল। অসাধ্যকে সাধ্য করা, অপরাজেয়কে পরাজিত করা,অজানাকে জানাই তাদের কাজ। এক কথায় বলা যায়, যুবসমাজই জাতির প্রাণশক্তি, চালিকাশক্তি।

ইংলিশে একটি প্রবাদ আছে Youth is the golden period of life যৌবনকাল হলো জীবনের সোনালী অধ্যায়। যেই শক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাই লড়তে পারে, যেই শক্তি সকল জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ও সকল প্রকার কুসংস্কার রুখে দিতে পারে, তারই নাম যুবশক্তি। যেমন- পুরো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল নবী ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) যখন তার সম্প্রদায় তাকে মেলায় যেতে আহ্বান করল, তখন সে বলল, ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ "আমি অসুস্থ"[১]। তার সম্প্রদায় মেলায় চলে গেলে, অন্যায়ের প্রতিবাদী ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) সবগুলো মূর্তি ভেঙে শুধুমাত্র বড় মূর্তিটাকে রেখে দেয়। তারা চলে এসে যখন এই অবস্থা দেখলে, তারা বলল:

﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾

"আমাদের উপাস্যদের সাথে এই কাজ কে করেছে, নিশ্চয়ই সে জালিম। তারা বলল: আমরা একজন যুবককে এগুলোর ব্যাপারে সমালোচনা করতে শুনেছি, তার নাম ইব্‌রা-হীম।"[২]

তারা যখন যুবক ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করল, এই কাজ কে করেছে, তখন তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বললেন:

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾

"তাদের বড়টাকে জিজ্ঞাসা করো যদি তারা কথা বলতে পারে।"[৩]

অন্যায় ও বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক দুরন্ত স্পৃহার নাম যুবশক্তি। যেমন- ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর মাঝে দেখা যায় যে, তিনি অন্যায়ে অংশগ্রহণ না করে, বাতিলকে ভেঙ্গে দিয়ে মুশরিকদের মাঝে এমন এক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যা মুশরিকদেরকে সত্যিটা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল।

যাদের দুরন্ত স্পৃহাই ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে তাদের অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। মুশরিক থাকা অবস্থায় তিনি যেমন দৌড়ে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তেমনিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে সকল বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সকল মুশরিকদেরকে তাক লাগিয়ে মাত্র কয়েকজন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত দু'টি সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে এক সারির নেতৃত্বে ছিলেন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্য সারির নেতৃত্বে ছিলেন হামযাহ্ ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। যৌবনের প্রকৃত পরিচয় ছিল 'উমাইয়ের ইবনু হুমাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মাঝে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কয়েকটি খেজুর হাতে আসলে সাথে সাথে যুদ্ধের ডাক চলে আসায় জান্নাতে যেতে দেরি হবে এই ভয়ে দৌড়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা বরণ করেন।

দুরন্ত স্পৃহার সেই আগুন আজ দুনিয়ার মোহের ও পশ্চিমা সভ্যতার নোংরা বাতাসে হারিয়ে গেছে। কারণ আমাদের যুবকেরা হানজালা ইবনু আবী আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানে না, শুনেনি কেমন ছিল তার ঈমানি ও তারুণ্যের স্পৃহা, উদ্দীপনা। নববিবাহিত এই মহান সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নববধূকে ঘরে রেখে অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে চলে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। ফেরেশ্‌তাগণ তাকে গোসল দেন তাই ইসলামের ইতিহাসে তাকে বলা হয় غسيل الملائكة।

যুবক তুমি কি শুনোনি বাদশা হারুনুর রশিদের (১৩৯-১৭০) সেই কৃতিত্ব, যা তিনি বাগদাদের বুকে গড়ে তুলেছিলেন মাত্র ২১ বছর বয়সে।

হে যুব সম্প্রদায়! তোমরা কি শোনোনি ১৪৩২ সনে জন্ম গ্রহণ করা সেই মহাবীর মোহাম্মদ আল-ফাতিহ (রহিমাহুল্লাহ)'র কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের এক বিস্ময়কর ও চেতনা জাগানো ইতিহাস? তোমরা কি জানো তখন তার বয়স কত ছিল? মাত্র ২১ বছর। কি করে জানবে! তোমরা তো ব্যস্ত আছো ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পশ্চিমা নিকৃষ্ট সভ্যতা নির্মাণের প্রতিযোগিতায়। তোমার পোশাক ও আচরণের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, তুমি ব্যস্ত আছো মেসি, নেইমার, রোনালদোকে নিয়ে। যেটা প্রকাশ পাচ্ছে তোমার চুলে, তোমার প্যান্টে, তোমার প্রতিটি কাজে। তুমি ছিলে জাগ্রত, কিন্তু আফসোস! আজ তুমি ঘুমন্ত। হয়তোবা তোমার কারণেই আজ বিশ্বের প্রতিটি কোণে মুসলিমরা নির্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত। আর কত

★শিক্ষার্থী: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস-সালাফিয়্যাহ, জোরবাড়িয় কোনাপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

[১] *সূরা আস্-সা-ফ্‌ফা-ত: ৮৯।*

[২] *সূরা আল-আম্বিয়া-: ৫৯, ৬০।*

[৩] *সূরা আল-আম্বিয়া-: ৬৩।*

ঘুমিয়ে থাকবে? এখনই তোমার জাগার সময়। জাগো, আবার জেগে উঠো। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত একটি হাদীস তোমাকে ডেকে বলছে–

قال رسول الله (ﷺ) اغتنم قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وغنائك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك و فراغك قبل شغلك.

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তুমি তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই, তুমি তোমার জীবনকে কাজে লাগাও মৃত্যুর পূর্বেই, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ত হওয়ার পূর্বে।[1] এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যৌবন হলো জীবনের বসন্তকাল। রাসূল (ﷺ)-এর আরেকটি মহান বাণী তোমাকে ডেকে বলছে–

"لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيْمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ".

কিয়ামতের কঠিন ময়দানে আদম সন্তানের পা নড়বে না, যতক্ষণ না চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যথা- **১.** তার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছে, **২.** তার যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছে, **৩.** অর্জিত সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে, **৪.** তার জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু 'আমল করেছে?[2]

হাদীস দু'টি আমাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, আমাদের ঘুমন্ত হৃদয়কে আবার জাগিয়ে তুলতে পারে। প্রকৃত যুবক তো সে যে, নিজেকে জাগিয়ে তোলে, অন্যকেও জাগায়। একটি আরবি প্রবাদ আছে–

الشباب ربيع العمر فمن ضيع ربيعه فلا ينتظر الثمر عند حصاده.

যৌবন হলো জীবনের বসন্তকাল। যে তার বসন্তকালকে নষ্ট করে, সে যেন ফসলের আশা না রাখে।

হে যুব সম্প্রদায়! আজ বিশ্বের প্রতিটি জীব, প্রতিটি প্রান্ত থেকে চিৎকার করে তোমাকে ডেকে বলছে– হে যুবক! জাগ্রত হও, নিজেকে চেনো, দীনকে রক্ষা করো। আজ তুমি ঘুমিয়ে আছো বলে সমাজের কোনায় কোনায় দুর্নীতি ও অবিচারের মহড়া চলছে। আজ তুমি জাগ্রত নয় বলে অন্যায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এখনো কি জাগবে না? জাগার সময় কি এখনো আসেনি? তোমার দীন, মান, মা ও বোনের ইজ্জত, ভাইয়ের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য তোমার হৃদয়টা কি কাঁদে না? তারা চায় তোমাদের মাধ্যমে তাদের চোখের পানির সাথে তাদের হাজারো স্বপ্ন মাটিতে পড়ে না যাক। তারা চায় তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনবে একমাত্র তুমি। আর এজন্যই তো তুমি যুবক।

হে যুব-সম্প্রদায়! জেনে রেখো, যুবকরা ইতিহাস শুনেও না, পড়েও না। বরঞ্চ তারাই ইতিহাস তৈরি করে। তুমি জাগো, তুমি ঘুরে দাঁড়াও, তোমার ঘুমন্ত হৃদয় জাগিয়ে তুলে বলে দাও তুমিই পারবে। তুমি পারবে মুসলিমদের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে। তুমিই পারবে অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন, সবকিছুকে রুখে দিতে। তুমি জেনে রাখো ইতিহাসের সেই মহাবীর ইমাম ইবনুল কাসীর (রহিমাহুল্লাহ)'র কথা। তিনি দেখেছিলেন, তার চোখের সামনে তাতার বাহিনী মুসলিম ভাইদেরকে জবাই করে হত্যা করছে। তবুও পিছু হটেননি। তুমি জেনে রাখো! সেই মহাবীর মোহাম্মদ বিন কাসিম (রহিমাহুল্লাহ)'র সিন্ধু বিজয়ের কথা। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ইসলামী শাসন বা ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তুমি জেড়ে ফেলে দাও! পশ্চিমাদের সেই নোংরা সভ্যতাকে, ঘৃণা করো মেসি, নেইমার ও তার সহযোগীদের নিন্দিত আদর্শকে। তোমার পোশাকে, তোমার আচরণে লালন করো একমাত্র, সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শকে যা রয়েছে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (ﷺ) ও তার অনুসারীগণের মাঝে। যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"তোমাদের জন্য রাসূলের মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[3]

তুমি ঘৃণা করো স্পেনের সেই ঘাতকদের, যারা মুসলিমদের প্রায় আটশত বছরের সোনালী সভ্যতাকে কেড়ে নিয়েছে। তুমি দৃঢ় সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, মুসলিমদের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য যাতে করে তোমার মাধ্যমে আবার ফিরে আসে। তুমি কি চাও না সেই ভাগ্যবান দলের অন্তর্ভুক্ত হতে? যাদের ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।"[4]

অতএব **হে যুবসমাজ!** তোমরাই জাতির আশা, তোমরাই শক্তি, তোমরাই সম্পদ। তাই তোমরা তোমাদের মূল্যবান সময়কে সংরক্ষণ করো এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের ও জাতির উপকার করে যৌবনকে সমৃদ্ধ করো। আল্লাহ আমাদের যুবকদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন। তিনি যেন আমাদের এই যুবসমাজকে জাগ্রত করে দেন –আমিন।

---

[1] *সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ৩৩৫৫।*
[2] *সুনান আদ্ দারেমী- হা. ৫৫৬।*
[3] *সূরা আল-আহ্যা-ব: ২১।*
[4] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১১০।*

স্মৃতির আঙিনায় প্রিয় বন্ধু ফারুক আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ)

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম –*লেখক, অনুবাদক ও গবেষক।*

ফারুক আহমাদ- একটি নির্মল হৃদয়ের প্রতিচ্ছবির নাম। বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য ও শিষ্টাচারের অপূর্ব সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই মানুষটি ছিলেন যেন সদাচার ও উত্তম চরিত্রের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর হাসিমাখা মুখ, আন্তরিক ব্যবহার এবং সবার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে তাঁকে চিরস্থায়ী আসন করে দিয়েছে।

তিনি ছিলেন এদেশের তাওহীদপন্থী যুবকদের অন্যতম প্রাণের সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ২০১১-২০১৭ সেশনের সেক্রেটারি জেনারেল। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা, আদর্শে অবিচলতা এবং দীনের খেদমতে নিরলস প্রচেষ্টা তাঁকে সহযোদ্ধাদের কাছে করে তুলেছিল এক নির্ভরতার নাম।

কিন্তু মহান আল্লাহর ফয়সালার সামনে মানুষের সব পরিকল্পনাই ক্ষণস্থায়ী। গ্রামের বাড়িতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। এরপর তাঁকে ঢাকার একটি স্বনামধন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় হাসপাতালের শয্যায় তিনি নীরবে লড়াই করেছেন। শরীর ছিল প্যারালাইজড, কিন্তু তাঁর সজাগ মস্তিষ্ক, দৃঢ় ঈমান ও মহান রবের প্রতি অটল আস্থা যেন সবাইকে ধৈর্য্য ও তাওয়াক্কুলের এক অনন্য শিক্ষা দিয়ে গেছে।

অবশেষে গত ২৪ জুলাই, শুক্রবার সকালে, মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জীবনের পথে যাত্রা করেন। রেখে যান অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষীর অশ্রুসিক্ত স্মৃতি, ভালোবাসা এবং তাঁর সুমহান চরিত্রের অমলিন দৃষ্টান্ত।

*আজ আমরা সেই প্রিয় মানুষটির স্মৃতির কিছু আলোকরেখা অনুসরণ করব- প্রিয় লেখক ও গবেষক নুরুল ইসলামের হৃদয়ছোঁয়া কলমে। আল্লাহ তা'আলা মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন, তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচায় পরিণত করুন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সবরে জামিল দান করুন –আমীন। -**নির্বাহী সম্পাদক***

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কিছু মানুষ তাঁদের চরিত্র, কর্ম ও ভালোবাসার মাধ্যমে মৃত্যুর পরও মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন। আমার সহপাঠী, দীর্ঘদিনের সহযাত্রী ও প্রিয় বন্ধু ফারুক আহমদ ছিলেন তেমনই একজন। যিনি গত ২১ জুন কাঁঠালগাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৪ জুলাই জুমু'আর দিনে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত করেছে।

২০০2 সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিচয়। সেই পরিচয় ধীরে ধীরে গভীর বন্ধুত্বে রূপ নেয়। ছাত্রজীবন, গবেষণা, চাকরি ও দাওয়াতি কার্যক্রম–জীবনের নানা অধ্যায়ে আমরা দীর্ঘ সময় পাশাপাশি চলেছি। তাই তাঁর মৃত্যু আমার কাছে শুধু একজন বন্ধুর বিদায় নয়; আমার জীবনের একটি মূল্যবান অধ্যায়েরও সমাপ্তি।

০১. রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান: তিনি ১৯৮৫ সালে গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর এলাকার পাইনশাইল গ্রামে এক ধর্মপ্রাণ, রক্ষণশীল ও মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার পরিবেশে তাঁর বেড়ে ওঠা। সেই পারিবারিক শিক্ষাই তাঁর চরিত্রের ভিত নির্মাণ করে।

তাঁর সরলতা ও রক্ষণশীলতার একটি স্মৃতি আজও মনে পড়ে। অনার্স শেষ করার পরও তিনি কখনো প্যান্ট-শার্ট পরেননি। বন্ধুদের জোরাজুরিতেই প্রথমবার তাঁকে প্যান্ট-শার্ট পরানো হয়েছিল। বিষয়টি আজ স্মৃতিতে হাসির উপলক্ষ হলেও, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক মূল্যবোধের একটি স্বাভাবিক প্রকাশ বলেই আমার কাছে মনে হয়।

ব্যক্তিগত আচরণেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযত ও লাজুক স্বভাবের। অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বা অকারণ আলাপচারিতা তিনি এড়িয়ে চলতেন। বিশেষ করে নারীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় দৃষ্টি অবনত রেখে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলাই ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর এই আচরণ ছিল ব্যক্তিগত শালীনতা ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধের বহিঃপ্রকাশ।

০২. মেধা, অধ্যবসায় ও জ্ঞানপিপাসা: শিক্ষাজীবনে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও অধ্যবসায়ী। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পরও তাঁর শিক্ষাযাত্রা থেমে থাকেনি। তিনি ২০১৩ সালে সীরাতুন্নবী সাহিত্য বিষয়ে এমফিল সম্পন্ন করেন। এরপর জনস্বাস্থ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ থেকে তিনি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (AIUB) থেকে মাস্টার ইন পাবলিক হেলথ (MPH) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পপুলেশন সায়েন্সে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল–শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের সিঁড়ি নয়; এটি মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত এক আমানত।

০৩. কর্মজীবনে নিষ্ঠা ও পেশাগত উৎকর্ষ: কর্মজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি সততা, দক্ষতা, দায়িত্ববোধ ও পেশাদারিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে জনস্বাস্থ্য, মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি উন্নয়ন, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। কর্মজীবনের শুরুতেই সুনবুলাহ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ও এসএসটিএসে দায়িত্ব পালনকালে তিনি আমার এলাকার অসহায় ও প্রান্তিক মানুষের জন্য নগদ অর্থ, সেলাই মেশিন ও গবাদিপশু প্রদান করে বহু পরিবারকে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেন।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রিভেনশন অব সেপটিক অ্যাবরশন (বাপসা), ঢাকা আহ্সানিয়া মিশনের ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ পুষ্টি কার্যক্রম, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ে জাইকার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতা সহকর্মীদের গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করে।

ফারুক আহমদের কর্মজীবনের মূল দর্শন ছিল—মানুষের কল্যাণই সর্বোত্তম 'ইবাদত। তাই তাঁর কাছে চাকরি কেবল জীবিকা অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং মানুষের সেবা করার একটি মহৎ দায়িত্ব।

০৪. সংগ্রামী জীবন ও মানবিকতা: ছোট্ট এই জীবনে তিনি নীরবে অনেক সংগ্রাম করেছেন। ব্যক্তিগত কষ্টকে কখনো আলোচনার বিষয় বানাননি। তিনি নিজের কষ্ট কখনো কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। মুখে ছিল প্রশান্তির হাসি, আর অন্তরে ছিল অটুট ধৈর্য্য, আত্মমর্যাদাবোধ এবং মহান আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা। নিজের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তিনি অনেককে গোপনে সাহায্য করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গোপনে করা মানবসেবাই সবচেয়ে মূল্যবান 'ইবাদত। মানুষের প্রয়োজনের মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানোই ছিল তাঁর কাছে বড় কর্তব্য। জনস্বাস্থ্য খাতে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনেও একই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়।

০৫. দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে তাঁর ভূমিকা: ফারুক আহমদ শুধু একজন দক্ষ পেশাজীবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ দায়ী ইলাল্লাহ। ছাত্রজীবনে জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সান্নিধ্যেই আমি শির্ক-বিদআতের বাস্তব ধারণা, সহীহ 'আক্বীদাহ্, তাওহীদের গভীর তাৎপর্য এবং সালাফদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। সত্য ও নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন; কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা কখনো রূঢ়তায় রূপ নেয়নি। যুক্তি, প্রজ্ঞা ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে তিনি নিজের অবস্থান তুলে ধরতেন। মতভেদ তাঁকে কখনো অসহিষ্ণু করেনি।

০৬. বন্ধু হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য: বন্ধু হিসেবে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সময়ানুবর্তী ও আন্তরিক। পড়াশোনা কিংবা কর্মব্যস্ততার মাঝেও বন্ধুদের জন্য সময় বের করতেন। কেউ সমস্যায় পড়লে যথাসাধ্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেন। আমার পরিবারের সঙ্গেও তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিশেষ করে আমার মায়ের চিকিৎসার সময় তাঁর সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এই ঋণ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

০৭. নিরহংকার এক আলোকিত মানুষ: উচ্চশিক্ষা, পেশাগত সাফল্য কিংবা সামাজিক পরিচিতি –কোনোটিই তাঁকে অহংকারী করে তোলেনি। তিনি ছিলেন সহজ, সংযত ও বিনয়ী। নিজের অর্জনের চেয়ে দায়িত্ব পালন এবং মানুষের উপকার করাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর এই স্বভাবই তাঁকে পরিচিতজনদের কাছে সম্মানী করে তুলেছে। কর্মক্ষেত্র হোক কিংবা ব্যক্তিগত জীবন –যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সহকর্মী, বন্ধু ও অধীনস্থ সকলের কাছে তিনি ছিলেন সততা, দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল প্রতীক।

০৮. অসমাপ্ত থেকে গেল অনেক স্বপ্ন: পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল। কর্মব্যস্ততার মাঝেও পরিবারকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য আরো বৃহত্তর পরিসরে কাজ করা। কিন্তু মানুষের পরিকল্পনার ঊর্ধ্বে মহান আল্লাহর ফয়সালাই চূড়ান্ত। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়, তাঁর বিনয়, দায়িত্ববোধ, কর্মনিষ্ঠা ও মানবিক আচরণ তাঁকে স্মরণ করার যথেষ্ট কারণ হয়ে থাকবে। মানুষের জীবন একদিন শেষ হয়; কিন্তু তার উত্তম চরিত্র ও কল্যাণকর কাজ মানুষের স্মৃতিতে দীর্ঘদিন টিকে থাকে। ফারুক আহমদের জীবনও সেই সত্যেরই একটি নীরব উদাহরণ।

০৯. সর্বশেষ তাঁর জন্য দু'আ: মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা– হে আল্লাহ! তুমি ফারুক আহমদকে ক্ষমা করে তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচায় পরিণত করো। তাঁর কবরকে প্রশস্ত, নূরময় ও শান্তিময় করো এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করো।

তাঁর স্ত্রী, সন্তান, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের এই শোক ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন করার তাওফীক্ব দাও। তাঁর রেখে যাওয়া সৎকর্ম, ইলম, দা'ওয়াতি প্রচেষ্টা ও মানবসেবাকে সাদাক্বায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করো –আমীন।

عَالَمُ النِّسَاءِ / মহিলা জগত

কুরআন হাদীসের আলোকে নারীদের মসজিদে সালাত আদায়ের বিধান

আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমাদ

[তৃতীয় (শেষ) পর্ব]

অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) تَقُوْلُ لَوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ.

"'আব্দুর রহমান-এর কন্যা 'আমরাহ্ (رحمها الله) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ) এর স্ত্রীন 'আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে বলতে শুনেছেন, মহিলারা (সাজসজ্জার যেসব) নতুন পন্থা বের করে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এগুলো দেখলে বানী ইসরাঈলের মহিলাদের মতো তাদেরকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন, আমি 'আমরাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, ইসরাঈল বংশের মহিলাদের কি মসজিদে আসতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।"[১]

অর্থাৎ- উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী আম্মাজান 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) নিজেও তার জীবদ্দশায় অন্যান্য মহিলাদের সাথে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন, কিন্তু কোনো এক পর্যায়ে এসে সমাজের নারীদের চলাফেরা, সাজসজ্জার অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, মহিলারা (সাজসজ্জার যেসব) নতুন পন্থা বের করে নিয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এগুলো দেখলে বানী ইসরাঈলের মহিলাদের মতো হয়তো তাদেরকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। এখানে দুইটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি যে, প্রথম বিষয় হচ্ছে 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) সমাজের অবস্থা দেখে যখন এই কথা বলতেছেন তখন অলরেডি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন! অর্থাৎ- নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়েই গিয়েছে, নতুন করে হালাল হারামের বিধান আর দুনিয়াতে আসবেনা। দ্বিতীয় বিষয় এটা ছিল 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)'র একটি আশঙ্কা, এটি অবধারিত কোনো বিষয় ছিল না, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)-কে কোনো নির্দেশনা অথবা ভবিষ্যৎবাণীর মাধ্যমে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধও করে যান নি; বরং অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে তিনি নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাঁধা দিতে নিষেধ করেছেন। অতএব এই হাদীসে 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)'র আশঙ্কা করা "মহিলারা (সাজসজ্জার যেসব) নতুন পন্থা বের করে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এগুলো দেখলে বানী ইসরাঈলের মহিলাদের মতো তাদেরকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন" এই বাক্যের মাধ্যমে কখনোই নারীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমোদনের বিষয়টি নিষিদ্ধ ঘোষণার আওতাভুক্ত হয় না। কারণ এই কাজটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জীবদ্দশায় সম্পন্ন করে যাননি এবং কাউকে সম্পন্ন করার দায়িত্বও দিয়ে যাননি। উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (رحمه الله) তার সহীহ মুসমিমে "অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া কিন্তু সুগন্ধি মেখে তারা বের হবে না" শিরোনামে ৩০তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন।

অপর এক হাদীসে একইভাবে এসেছে,

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَتْ نَعَمْ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহধর্মিনী 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি আজকের মহিলাদের এরূপ অবস্থা দেখতেন (যেমন- সুগন্ধি লাগানো, বেপর্দা চলা), তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। যেরূপ নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল বানী ইসরাঈলের মহিলাদের। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বলেন, আমি 'আমরাহ্‌কে বললাম, বানী ইসরাঈলের মহিলাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।"[২]

উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (رحمه الله) তার সুনানে আবূ দাউদে "নারীদের মসজিদে যাতায়াতে কঠোরতা" শিরোনামে ৫৪ ও ৫৭তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। অতএব উক্ত হাদীসগুলো কখনোই নারীদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না; বরং ইতিপূর্বের অন্যান্য হাদীসগুলো থেকে নারীদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়টি অনুমোদিত এবং সাহাবায়ে কেরামদের 'আমল দ্বারা সাব্যস্ত বলে আমরা জেনেছি।

সবশেষে জরুরি কিছু কথা: মহান আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করা অথবা মহান আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার অধিকার পৃথিবীর কারো নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[১] *সহীহ মুসলিম- ৮৮৫।*

[২] *সুনান আবূ দাঊদ- ৫৬৯।*

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا﴾

“আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু’মিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।”[১]

অর্থাৎ- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু’মিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না।

উপরক্তো আজকের এই প্রবন্ধে নারীদের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় সম্পর্কিত হাদীসগুলোর পর্যালোচনা থেকে এটাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে নারীদের জন্য মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা হারাম অথবা নিষিদ্ধ নয়; বরং পরিপূর্ণ পর্দা, শালীনতা, সুগন্ধি ব্যবহার না করাসহ আরো বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে হালাল এবং বৈধ। তবে অবশ্যই নারীদের সুরক্ষা অথবা নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই আমাদেরকে সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে। যে বা যারা আজকে নারীদেরকে ফিতনা বা নিরাপত্তার অজুহাতে মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করতেছেন তারা তো মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদেরকে ফিতনা বা নিরাপত্তার অজুহাত দাড় করাচ্ছেন না। উপরন্তু আমরা কি দেখতে পাই? অনেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অফিস, বাস ট্রেনসহ গণপরিবহণে এবং কি মাদ্রাসাতেও নারীদেরকে শ্রীলতাহানীসহ ধর্ষণ এর মতো ঘটনা ঘটার মতো খবর আমরা শুনতে পাই। এক্ষেত্রে কি তারা ওইসব জায়গাগুলোতেও নারীদের ফিতনা ও নিরাপত্তার অজুহাতে যাওয়া নিষিদ্ধ করবেন? একজন নারী যদি বাজারের মতো নিকৃষ্ট জায়গায় অনায়েসে যেতে পারে তবে মহান আল্লাহর ঘরে কেন যেতে পারে না? যেখানে হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا".

“আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদসমূহ আর সব চাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ।”[২]

আরব ভুখণ্ডের মসজিদগুলোসহ মুসলিমের হৃদয়ের স্পন্দন মক্কা এবং মদিনা দুই হারামে এবং ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চিনের মতো দেশগুলো যদি মহিলাদের জন্য মসজিদে পৃথক ব্যবস্থাপনাসহ সালাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা রাখতে পারে তবে আমরা কেন পারি না? পারি না বললে ভুল হবে; বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই আমরা করি না! কেননা এই দেশের অনেক সালাফী ‘আক্বিদাহ্ মানহাজের আলোকে পরিচালিত আহলুল হাদীস মসজিদগুলোতে নারীদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ববস্থাপনাসহ সালাত আদায়ের সু-ব্যবস্থা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং আমাদের প্রতিটি মসজিদ হওয়া উচিৎ একেকটা মারকাজ, যেখানে থেকে দ্বীনের আলো ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ এবং দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে যাবে। এই কাজ আমরা কখনোই পুরুষের চেয়ে অধিক সংখ্যক নারীদেরকে উপেক্ষা করে সম্ভব করতে পারবো না! এমনিতেই আমাদের দেশে পুরুষের চেয়ে নারীরা দ্বীন শিক্ষার দিকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যার ফলে কুসংস্কার, জাহিলিয়াত, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা তাদেরকে সকল দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এক্ষেত্রে আমাদের মসজিদগুলো হতে পারে জ্ঞান বিতরণের আলোক বর্তিকা। নারী মানে শুধু নারী নয়; বরং নারী মানে একটা পরিবার, একজন নারী হতে পারে একজন শিশুর আদর্শ শিক্ষক। তাই মসজিদে শুধুমাত্র সালাত আদায় নয়; বরং মসজিদ হতে পারে জ্ঞান শিক্ষার মারকাজ। মসজিদের জুমু‘আর খুতবাহ্, দারস, হালাকা, তাফসীর ইত্যাদি থেকে নারীরা কুরআন-হাদীস থেকে বিশুদ্ধ ‘আক্বিদাহ্, মানহাজ, সিরাত, ঈমান, কুফ্র, শির্ক, বিদআত, ‘ইবাদত, মুয়ামালাত, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়গুলো জানতে পারে। কিন্তু ইবলিশ এবং মানবরূপী ইবলিশগুলো চায় না কোনোভাবেই আমাদের ভালো কাজগুলো ব্যাপকভাবে শুরু হোক এবং মুসলিমরা তাদের সঠিক দ্বীনের উপর চলুক। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। আমাদের সকলের উচিৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কথা চিন্তা করে ইসলামের মুলধারায় চলে আসা। আমাদের মাঝে অনেকেই হক্ব জানার এবং বুঝার পরেও গ্রহণ করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে হক্ব সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও হক্বকে গ্রহণ না করাই হচ্ছে অহংকার। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে চেনার এবং গ্রহণ করার তাওফীক্ব দ্বীন –আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

---

[১] *সূরা আল-আহ্যাব: ৩৬।*
[২] *সহীহ মুসলিম- ১৪১৪।*

المعرفة من خلال القصص / গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

জবাব

সুপ্ত রায়হান সজিব*

[চতুর্থ (শেষ) পর্ব]

দরজায় প্রচণ্ড জোরে করাঘাতের শব্দ। ওরা বুঝতে পারে লোমহর্ষক কিছুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ওরা।

ভয়ে সিঁটিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মহান আল্লাহর নাম জপতে থাকে।

বিকট শব্দে কাঠের দরজাটি ভেঙে যায়।

ভেতরে প্রবেশ করে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত সশস্ত্র হায়েনার দল। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত মারণাস্ত্র। নবদম্পতি ওঠে দাঁড়ালো।

'আব্বাস দু'হাত প্রসারিত করে ফাতিমাকে আঁড়াল করে রাখে। ওদের ভেতরকার কমান্ডার সদৃশ ষণ্ডামার্কা লোকটা ইশারায় কি যেন নির্দেশ দিলো।

হুকুম পালন করতে এক হায়েনা নবদম্পতির দিকে এগিয়ে গেল। সে কারাতে কায়দায় আব্বাসের মুখ বরাবর ঘুষি মারলো।

আঘাত সইতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে।

মুখবিবর হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

ফাতিমা দৌড়ে এসে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে দু'হাতের তালু একত্র করে করুণ সুরে মিনতি করতে লাগলো।

কিন্তু ও জানে না যে এরা মানুষরূপী পশু।

মিনতির ভাষা বোঝার সামর্থ্য এদের নেই।

এদের চেয়ে শিকারী নেকড়ের মনে যথেষ্ট মমত্ববোধ আছে। কমান্ডারের দৃষ্টি তখন ফাতিমার শরীরের ভাঁজে নিবদ্ধ। অট্টহাসি হেসে আব্বাসকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো। কতিপয় সেনাসদস্য আব্বাসকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলো।

তখনো একের মুঠোয় অপরের হাত শক্ত করে ধরা।

আমৃত্যু এক সাথে থাকার সংকল্প নিয়ে মহান আল্লাহর কালামে গড়া যে বন্ধন সেটার সাময়িক বিচ্ছেদ কি আর এতো সহজে সংঘটিত হয়।

দু'জনের চোখেই অশ্রু ঝরছিল।

ফাতিমার বুক ফাটানো কান্নায় আকাশ বাতাস যেন প্রকম্পিত হয়ে ওঠলো।

আব্বাস কান্না বিজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে– "আল্লাহর দোহাই লাগে ওকে ছেড়ে দে। আমার জীবনটা নিয়ে নে। তবুও ওর কোনো ক্ষতি করিস না।"

এ যেন শিকারীর সামনে শরবিদ্ধ শিকারের আর্তনাদ।

কিন্তু, করুণ বুলিতে তো শিকারীর মন গলবে না।

শিকারীর কলব যে নষ্ট কালো পাথরে মোড়ানো।

পাপ-পঙ্কিলতায় দুর্গন্ধযুক্ত সেই কলব, যা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন।

আব্বাসকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর কমান্ডার ব্যতীত বাকিরাও বাইরে চলে আসলো।

ফাতিমার হাত ও পা বাঁধা। দরজা বন্ধ করে ষণ্ডামার্কা লোকটি ফাতিমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সইতে না পেরে ওর করুণ আর্তনাদে বিদীর্ণ গগন প্রকম্পিত হলো। আব্বাসের কানে সেই আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে কলিজায় ছুরির মতো বিধঁছে।

সারাজীবনের সাধনার ধন ওই স্রষ্টাপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহারটিকে খুবলে খাচ্ছে এক নিকৃষ্ট জানোয়ার।

অন্তরের অন্তঃস্থলে যার বাস, তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিন্নভিন্ন করছে এক নরাধম শয়তান।

আর সইতে পারছে না আব্বাস।

ওর ইচ্ছে করছে এই হায়েনাদের জীবনের যবনিকাপাত ঘটিয়ে ওর ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনে।

ওর মস্তিষ্কে কে যেন বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত করলো।

শত পুরুষের শক্তি এসে ভর করলো ওর শরীরে।

কয়েকজন নরপিশাচকে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিলো। বাকিরা এগিয়ে আসতেই দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। দু-তিনবার আঘাতের ফলে নরম কাঠের দরজা ভেঙে গেলো। ভেতরের বর্বর দৃশ্য সইতে পারলো না আব্বাস।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে মুহুর্মুহু বুলেটের বৃষ্টিতে ধরাশায়ী হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কমান্ডারের মুখে তখন ক্রুর হাসি। ফাতিমা ততক্ষণে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মূর্ছা গেছে। জ্ঞানহীন নিথর দেহটির ওপর পুনরায়

* *সদস্য, মাদারগঞ্জ উপজেলা শুব্বান।*

ঝাঁপিয়ে পড়লো কমান্ডার। কমান্ডারের দেহের ক্ষুধা মিটে গেলে বাকি সদস্যরা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একে একে প্রায় ১১ জন নরপাপিষ্ঠের শারীরিক জুলুমের শিকার হয় বোনটি।

এ যেন বাগানে মালীর মৃতদেহকে অতিক্রম করে প্রস্ফুটিত গোলাপের ওপর কীটপতঙ্গের ভীরুময় আক্রমণ। ফাতিমার যখন জ্ঞান ফিরে তখন দেখতে পায় ওর দেহ ভোগে মত্ত ওরই আপন ছোট চাচা।

বৃদ্ধা মাকেও রেহাই দেয়নি। পাশেই মায়ের নিস্তেজ নগ্ন দেহ জড়িয়ে শুয়ে আছে ওর বড় চাচা।

বাবা ও ভাইকে সামনে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রেখেছে। লজ্জায় ওরা মাথা নত করে শুধু স্রষ্টার দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। কপোল বায়িত অশ্রু ফোঁটা অভিশাপ হয়ে মহান আল্লাহর আরশ যেন কেঁপে ওঠছে।

এভাবেই চললো কয়েকঘন্টা। এলাকার প্রভাবশালীরাও রীতিমতো ধর্ষণ করলো ফাতিমাকে।

বাবা ও ভাইকে গুলি করে বেয়নেট দিয়ে চোখ খুবলে নিলো। তারপর, মা ও মেয়েকে অনেক দুয়ো দিয়ে বাইরে এনে লাশের স্তুপের মাঝে ফেলে দিলো।

লুটকৃত মালের বন্টন নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে স্থানীয় রাখাইনদের বিরোধ সৃষ্টি হয়।

সশস্ত্র বাহিনী রাখাইনদের ধাওয়া দিলে ওরা পালিয়ে যায়। লাশগুলোর মাঝে মূর্ছিত মেয়েকে নিয়ে সটান হয়ে শুয়ে থাকে মা। আহ্ কি অমানবিক এ দৃশ্য!

এর চেয়ে হৃদয়বিদারক আর কি হতে পারে?

নগ্ন মায়ের কোলে নগ্ন যুবতী মেয়ের ধর্ষিত দেহ।

যাহোক, বাড়ির সামনেই বিশাল বড় এক গণকবর খনন করা হলো। পুরো গ্রাম জুড়ে গণহত্যা চালানো হয়েছে। অনেক লাশ এনে এখানে জড় করা হচ্ছে।

লাশের সংখ্যা ৪০০ এর কম হবে না।

একটুপর এগুলোকে গণকবরে সমাহিত করা হবে।

লাশের স্তুপের মাঝে এখনো যারা জীবন্ত ও নড়াচড়া করছে, তাদেরকে বেয়নেটের আঘাতে মেরে ফেলা হচ্ছে। জীবন্ত ধর্ষিত মেয়েদের মুখে এসিড ঢেলে দিয়ে চেহারা বিকৃত করে দিচ্ছে। মা রেবেকা রায়ান বুঝতে পারলেন যে, লাশের স্তুপ হতে সরে যেতে হবে।

নয়তো করুণ মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে।

এখন বাঁচাটাই জরুরি, কারণ বাঁচতে না পারলে এদের নির্যাতনের বর্ণনা বিশ্ববাসীর কছে প্রেরণ করবে কারা?

একটুপরে নরপিশাচরা বিয়ের রান্না করা খাবার দিয়ে ভোজ সারতে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই মেয়েকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়লেন মা।

পেটপূজো শেষে সবাই মিলে লাশগুলোকে বিরাট গর্তে ফেলে মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলে।

সৃষ্টি হয় একটি গণকবর।

সবকিছু সম্পন্ন করে ওরা চলে যায়।

জঙ্গল থেকে বের হয়ে মেয়েকে জাগিয়ে তুলে।

জনধর্ষিতা মেয়েটি তখন যন্ত্রণায় কাতর।

তবুও, ওকে নিয়ে পায়ে হেঁটেই গ্রাম পেরিয়ে নদীর ধারে উপস্থিত হয়। নদীতীর লোকে লোকারণ্য।

শত ধ্বস্তাধস্তির মাঝে কিভাবে যে নৌকায় ওঠেছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। ইন দিন ও মিয়াও মি চ্যাং গ্রামেও এমন গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে।

এসব গ্রামের লোকেরাও নদীতীরে ভিড় জমিয়েছে।

ওদের নৌকা যখন মাঝনদীতে, তখন কূলে হামলা চালায় সশস্ত্র বাহিনী। কালো অন্ধকারে ভেসে আসে মাজলুমের করুণ চিৎকার।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহায়তায় এই পরিষদে আসার পর ফাতিমার জ্ঞান ফিরে।

ততক্ষণে সে নির্মম মানসিক চাপে উন্মাদ হয়ে গিয়ে আবোল তাবোল বলছে।

তারপর সবকিছু আমার সম্মুখেই সংঘটিত হলো।

ডাইরীর পাতাটি বন্ধ করলাম।

হুমম, এতক্ষণ যা পড়ছিলাম তা আমার অতীত দিনলিপির এক টুকরো অংশ।

গরম কফির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে বর্তমানে হারিয়ে গেলাম। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের ভয়াল চিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিশনে রিপোর্ট করেছিলেন।

এই কমিশনও রোহিঙ্গাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশহীন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছিল।

হারিয়ে যাওয়া নাগরিকত্ব ওদের ফিরিয়ে দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান করেছিলো এই কমিশন।

সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গা নারীদের ব্যাপকহারে ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ ওঠার পর জাতিসংঘের

অনেক কর্মকর্তা এটাকে "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই গণহত্যা ও নির্যাতনের জের ধরে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গাদের ঢল শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের টেকনাফ সীমান্তে।

যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজে।

সে ঢলের গতি যখন কমে আসলো ততদিনে প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা ঠাঁই নেয় কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে। বাংলাদেশে অবস্থান করা রোহিঙ্গাদের বক্তব্যে উঠে আসে রাখাইনে সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র।

রাখাইনে সাংবাদিক ও এনজিও কর্মীদের যাতায়াতে বিধি নিষেধ থাকায় ভয়াবহ নির্যাতনের কম অংশই গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। আজ দীর্ঘদিন পর সাবেক কর্মস্থল টেকনাফ সদর হাসপাতালে যাচ্ছি।

রদবদলের খেলায় এখন এক মফস্বলে কর্মরত আছি।

তাই পুরনো ডাইরির পাতায় স্মৃতির পসরা সাজিয়ে রোমন্থন করলাম। "অতীত" মানুষের "বর্তমান" ও "ভবিষ্যত"-কে আষ্টেপৃষ্টে ধরে রাখে।

তাই হয়তো মানুষ অতীত হতে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা পায়। আমার বেলাতেও সেটাই বিদ্যমান। হাসপাতালে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান শেষ হতে দুপুর ২:০০টা বাজলো।

ভাবলাম ইউনিয়ন পরিষদ হতে একটু ঘুরে আসি।

ড্রাইভার বললো টেকনাফ হতে ১৫ কি.মি. দূরে সরকারী ভূমিতে লেদা রোহিঙ্গা শিবির নামে একটি শরণার্থী শিবির গড়ে তুলেছে স্থানীয় প্রশাসন।

সেখানেই যাওয়ার জন্য মনস্থির করলাম।

টেকনাফ হতে হ্নীলা ইউনিয়ন পর্যন্ত নতুন পাকা হাইওয়ে রোড তৈরির বদৌলতে আমরা আধাঘন্টার মাঝেই উপস্থিত হলাম।

গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

মানুষের জীবন যে কতোটা মানবেতর হয় তা এতদিন আমার কল্পনাতীত ছিল। ছোট ছোট ঝুপড়িঘরে গাদাগাদি করে কয়েক লক্ষ লোকের আবাস।

এদের মৌলিক অধিকার যে খর্বিত তা অভুক্ত শিশুদের শূন্য থালা বুঝিয়ে দিচ্ছে। মানবাধিকারের ধারাগুলো এখানে কবরস্থ হয়ে মুখ বুজে কাঁদে। এক বুক আক্ষেপ নিয়ে ফিরতি পথে হাঁটা শুরু করলাম।

প্রধান ফটকের সীমানায় আসতেই নারী কণ্ঠে সূরা মূলকের তৃপ্তিময় তেলাওয়াত কানে বাজলো।

মন মাতানো সেই তেলাওয়াতের ধ্বনি।

দ্রুতপদে এসে তেলাওয়াতকারীকে আবিষ্কার করলাম।

বোরকায় আপাদমস্তক আবৃত এক মহিলা ভাঙা চেয়ারে বসে মেরুন রঙের ওলের সূতায় কুশিকাটা দিয়ে একটি সোয়েটার বুনছে ও করুণ সুরে তেলাওয়াত করছে।

আমি কাছে যেতেই বলে ওঠলো: আব্বাস কোথায়? ও না আপনাদের সাথে আসবে আমাকে বলেছিল?

ও এলো না? বুঝতে পারলাম এটা আমার সেই বোন।

লোকমুখে জানতে পারলাম: "আগন্তুকদের দেখলেই বোনটি এই প্রশ্ন করে।" বৃদ্ধা মা গত হওয়ার পর বোনটি প্রধান ফটকের নিচের খোলা জায়গাটিতেই থাকে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ও শীতে কাঁপে।

আর, মেরুন রঙের সুতো দিয়ে বুনে যায় সোয়েটার।

ওনার সম্বল বলতে বস্তাভর্তি কয়েক ডজন সোয়েটার।

যা সে কাউকে দেয় না। স্বামীর জন্য জমিয়ে রাখে।

পাগলী বোনের দৃঢ় বিশ্বাস একদিন ও ফিরে আসবে।

আব্বাসের আত্মা যে এখন আরশে আজীমের ঐ মালিকের রাজ্যে –এটা সে বুঝতে চায় না।

আমার ক্রন্দনবিহীন চোখ দু'টি অশ্রুতে ভেসে যায়।

হ্যাঁ, এটা আমার বোন। পুরো মুসলিম উম্মাহর বোন।

নরপিশাচদের আক্রমণে সারা বিশ্বের নিযুত কোটি বোনের স্বপ্ন আজ ফাতিমার ন্যায় মুকুলেই ঝরে গেছে। আমার এই ধর্ষিতা বোন একজন জীবন্ত শহীদ।

রোজ হাশরের বিচারের ময়দানে আমার এই রোহিঙ্গা বোন যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে– "হে মুসলিম ভাই! যখন আমি ধর্ষিত হয়েছি, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য থাকতেও এগিয়ে আসোনি কেন?"

এভাবে ফিলিস্তিন, উইঘুর, চেচেন, ককেশীয়, কাশ্মীরের বোনরা যদি একবার দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন করে।

তখন কি জবাব দেব আমরা? জানি না।

জানতে ইচ্ছেও হয় না। শুধু ভয় হয় এই ভেবে যে আল্লাহ তা'আলার কাছে কি জবাব দেব। নেই। কোনো জবাব নেই। জবাবের ভাষা আমার বোনের আর্ত চিৎকারের মাঝে হারিয়ে গেছে।

প্রশান্তির শীতলতা

মোল্লা মাজেদ*

অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর সবটাই যদি আমাকে দিতে চাও
স্বেচ্ছায় প্রসারিত দু-হাত বাড়িয়ে
চুপিসারে আর নয় আর নয় ক্ষীণতায়
বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠ ভীরুতার
ক্ষীণতায় বলে দেবো দূর হও দূরে রও
জমাট রক্তের ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে
ফেলে যাও প্রশান্তির নিঃশ্বাস,
আর রক্তের লালিমায় নিক্ষিপ্ত চোখ রেখে
নির্লজ্জ চেয়ে রয় অনন্ত কাল ধরে অসীম আকাশ।

যদি দাও পূর্ণিমার চাঁদটাকে পুরোপুরি
একান্তই আমার হাতে,
অকাতরে বলে দেবো নিয়ে যাও বহু দূরে
কুৎসিত কলঙ্কের কালো দাগ রয়েছে ওতে।
চাঁদেও কলঙ্ক আছে যদিও তা জানি,
তবুও সৌন্দর্যের প্রতীক ওযে
বহুবার বহুক্ষণে হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে মানি।
প্রজ্জ্বলিত সূর্যটা দূরে আছে দূরে থাক
যাক আরো শত কোটি আলোক বর্ষ দূরে,
অন্ধকারে ছেয়ে যাক সৃষ্টির সব কিছু
ছড়িয়ে যাক গ্রহ হতে গ্রহ গ্রহান্তরে;
অন্তরালে হারিয়ে যাক দৃষ্টির সীমানা ছেড়ে
মিশে যাক পিষে যাক যত কিছু বাহিরে অন্তরে।
আমি চাই প্রশান্তির শীতলতা;
আমি চাই প্রশান্তির শীতলতা মানুষের মানবতা
ধর্ম নয় বর্ণ নয়, স্বজাতি বিজাতি নয়
একটু খানি নিরাপদ শান্তিপূর্ণ সুখ সজীবতা।

ক্ষনার বচন

ডা. সুলতান আহমদ*

খুব ছোট থেক না ছাগলে খাবে
খুব বড় হয়ো না ঝড়ে যাবে।
মধ্যম রও ভালো রবে।
ঢিকি আড়ালে গাল কাটে
ঠেলায় পড়লে বাঘ শেয়াল এক ঘাটে।
ধুলে কয়লা যায় না ময়লা
স্বভাব গুনে বুঝা যায়
বংশগুনে পরিচয়।

সব রসুনের মুখ এক খানে
সাপ সোজা গর্তপানে।
জাত বেজাত প্রেম না জানে।
শুন্য হাড়ি বেশি বাজে
তা না কে জানে?

চক চক করলে হয় না সোনা
আগুনে পোড়াতে হয়–
কষ্টি পাথরে যাঁচাই করে–
আসল সোনা চেনা যায়।

চোরের মার গলা বড়
জামার চেয়ে গেঞ্জি বড়।
মুনাফিকের মিষ্টি কথা
ঈমানীর তিতা কথা।
লোভে পাপ, পাপে বিনাশ
যদি বুঝে, না হয় সর্বনাশ।

ইসলামী বিজয় ধ্বনি

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

ইতিহাসে মুছে ফেলা সব বিশ্ব-নন্দিত জ্ঞান,
আরব-অনারব ছড়িয়ে উঠিয়ে সারা জাহান।
তাওহীদী কালেমায় মক্কায় জাহিলিয়াতের অবসান,
মদিনার মরু হয়েছিল বিশ্ব রাষ্ট্রীয় মান।
খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগের শাসন,
অর্ধজাহান হয়েছে সব ন্যায়পরায়ণ।
উমাইয়া খেলাফতে বিজয়ী পতাকা ভেঙেছে মূর্তি,
সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম হয়েছে পরাশক্তি।
মুহাম্মদ বিন কাসিম উড়িয়েছে সিন্ধু জয়ের পতাকা,
ভেদ করেছে সব অন্যায়ের বক্রতা।
তারিক বিন যিয়াদের গড়া আন্দালুস বিজয়,
কালেমার পতাকায় উতাল সমুদ্র করেনি ক্ষয়।
বিশ্ব-জ্ঞানের সভ্যতা গড়েছে স্পেনের কর্ডোভা,
মানবকুলের রঙে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আভা।
সমরকন্দ, বুখারা ও খোরাসানের হাদীসের প্রসার,
জগতকে আলোকিত করা হাদীসের ঊষার।
সমগ্র জগতের জল-স্থল এসেছে শান্তির ছায়া,
সবার মনে গড়েছে ইসলামের মায়া।
‘আব্বাসীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সভ্যতার উত্থান,

* বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।

* সভাপতি, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-পরিচালক (অব.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

* মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

বাইতুল হিকমাহ করেছে জ্ঞান প্রসারে অবদান।
তাওহীদী দ্বীনে সালাফদের করা সাধনা,
সত্য দ্বীন ধরে রাখার বিজয়ী চেতনা।
বাগদাদ ছড়িয়েছে সব জ্ঞানের আলো,
তাতারদের আক্রমণে সব হয়েছে ঘনকালো।
পৃথিবীতে যত চেষ্টা হয়েছে দ্বীন মুছে ফেলার চক্র,
পিছনে ফিরে তাকানো মুসলমানদের মন হয়নি বক্র।
ক্রুসেড আক্রমণে এসেছে যত পরাজয়,
তত বাইতুল মাকদিসে আইয়ুবীর ঝান্ডায় উঠেছে জয়।
যতবার চেষ্টা হয়েছে মুসলিমদের নাম করতে অবসান,
বিজয়ী ধ্বনিতে সম্ভব নয় মুছে ফেলা নাম ও নিশান।
সারা দুনিয়াতে করা হয়েছে যত পতনের স্বাদ,
ততবার এসেছে আইনে জালুতের করা উৎখাত।
মুহাম্মদ আল-ফাতেহ্'র বাইজেনটাইনের দুর্গ জয়,
বিশ্ব সভ্যতায় গড়েছে পরাশক্তির পরাজয়।
দ্বীনের আলোতে বিধর্মী মতবাদ করেছে যত অশালীন,
সংস্কার করেছে তত মুজাদ্দেদুল মুসলিমীন।
শিরক ও বিদআতের বেড়াজালে উঠানো যত ধ্বনি,
তাওহীদপন্থীদের এসেছে তত নয়নমণি।
আধুনিকতার মোহে পিছু ফিরবার নয়,
ভোগবাদ ও বস্তুবাদে হবে না জীবন অপচয়।
পাশ্চাত্য দর্শনে দেওয়া ভ্রান্ত মতাদর্শ,
সমস্ত জাহিলিয়াতকে ভেদ করে ওঠা ইসলামী আদর্শ।
ইসলামী বিজয়ের ধ্বনি উঠবেই আবারো,
বাতিলের উঠানো নাম ও নিশান থাকবে না কারো।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাবেক যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল এবং বর্তমানে ঢাকা জেলা জমঈয়তের সভাপতি উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থাবস্থায় ঢাকার মিরপুরে, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অতি দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা ও নেক হায়াত দান করেন, সেই কামনায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে একান্তভাবে দু'আ করছি। পাশাপাশি সকল মুসলিম ভাই-বোনের নিকট তাঁর জন্য বিশেষভাবে দু'আ করার অনুরোধ করছি। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে শিফায়ে কামিলা দান করেন -আমীন।

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل.

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারি জনাব জাকির হোসেন খান-এর বড় ভাই মো. জামিল খান দীর্ঘ দিন ক্যান্সারে আক্রান্ত থেকে গত ১ আগস্ট, শনিবার, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস-এর উচ্চ মাকাম দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতের জন্য দু'আ-আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

সাপ্তাহিক আরাফাতের "মেধার লড়াই (কুইজ প্রতিযোগিতা)"-র ফলাফল

প্রথম স্থান- আব্দুল মোহাইমেন, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

দ্বিতীয় স্থান-	তৃতীয় স্থান-
(১) **উমাইমা**, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	(১) **আসমা খাতুন**, ভবানিপুর, বাবুলিয়া, সাতক্ষীরা।
(২) **নুসাইবা**, ডেমরা, ঢাকা।	(২) **মাসুদ রানা**, সাহানগাছা, সিরাজগঞ্জ।
	(৩) **সিনিন সিনথিয়া**, মিরপুর, ঢাকা।

সান্তনা পুরস্কার- ১. আব্দুল্লাহ্ আল মুহসিন, ঠাকুরগাঁও। **২.** আব্দুল কুদ্দুস মিয়া, নারায়ণগঞ্জ। **৩.** নাজমুন নাহার নিপু। **৪.** মো. জাহাঙ্গির হোসেন, সাতক্ষীরা। **৫.** মনিরুজ্জামান খান, যশোর। **৬.** মুসফিকুর রহমান, শিবগঞ্জ, বগুড়া। **৭.** মো. আব্দুল করিম মিঞা, গাইবান্ধা। **৮.** মো. জামালউদ্দিন, ঠাকুরগাঁও। **৯.** ইমরান হোসেন, চট্টগ্রাম। **১০.** আব্দুস সালাম, জামালপুর।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): ***কাযা নামাযগুলোর জন্য তাওবাহ্ করলেই চলবে- না নামায আদায় করতে হবে?***

জবাব: উমরী কাযা যেটাকে বলে সম্ভবত সেটাই জানতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ- সে বালেগ হওয়ার দশ বছর পর থেকে রীতিমত নামায আদায় করে আসছে। এখন তার পিছনের ঐ দশ বছরের নামায আদায় করতে হবে কি না? যদি এমন হয় যে, বৃদ্ধবস্থায় এক ব্যক্তি তাওবাহ্ করলে যেটাকে 'তাওবাতান নাসূহা' বলা হয়। অর্থাৎ- যে তাওবাহ্ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং সে কিছুকাল পরেই মারা গেল। এই অবস্থায় তার জীবনের কাযা নামাযগুলোর জন্য আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন কি না?, তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস রয়েছে যেমন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবাহ্ মৃত্যুকালীন কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবুল করে থাকেন। *(তিরমিযী- হা. ৩৫৩৭, হাসান)*

অর্থাৎ- কোনো ব্যক্তি যদি সারাটা জীবন গুনাহ ও পাপের মধ্যে অতিবাহিত করে কিন্তু মৃত্যুকালীন অচেতনতার পূর্বেই যদি সে সঠিকভাবে তাওবাহ্ করে তাহলে তার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। অবশ্য যদি মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর তাওবাহ্ করে তাহলে তার গুনাহ ক্ষমা হবে না। যেমন ফিরাআউনের গুনাহ ক্ষমা হয়নি। অতএব মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাওবাহ্ করা একান্ত জরুরি। সুতরাং কাযা নামাযের জন্য তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন এবং প্রত্যেক নামাযের সাথে এরূপ কাযা আদায় করা শারীয়াতে বিধান নেই। বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে হবে। কারণ, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, কারো ফর্য সালাত কম হলে নফল নামায দিয়ে তা পূর্ণ করা হবে। *(আবূ দাউদ, আহমদ)*

জিজ্ঞাসা (০২): ***যাদের কাছে নবী (ﷺ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা কোন ধরনের শিরকে লিপ্ত ছিল?***

জবাব: যাদের নিকট নবী (ﷺ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা তাওহীদে রুবূবীয়্যাতে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করত না। কুরআনে কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, তারা কেবলমাত্র তাওহীদে উলুহীয়াতে আল্লাহর সাথে শির্ক করত। রুবূবীয়াতের ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহই একমাত্র রব বা পালনকর্তা। তিনি অসহায়ের ডাকে সাড়া প্রদানকারী এবং বিপদাপদ দূরকারী।

কিন্তু তারা 'ইবাদতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করত। এ ধরণের শির্ক মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কেননা তাওহীদের অর্থ হলো মহান আল্লাহকে 'ইবাদতের ক্ষেত্রে একক করা। মহান আল্লাহর জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট হক্ব রয়েছে, যা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব। এই হক্বগুলো তিন প্রকার। যথা- **১.** মালিকানার অধিকার। **২.** 'ইবাদত পাওয়ার অধিকার। **৩.** নাম ও গুণাবলীর অধিকার।

এই জন্যই উলামাগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তাওহীদুর রুবূবীয়্যা, তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত এবং তাওহীদুল উলুহীয়া। মুশরিকরা শেষ প্রকারের তাওহীদে মহান আল্লাহর সাথে শরীক করত, আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করত। আল্লাহ বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।" *(সূরা আন্-নিসা: ৩৬)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। তবে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন।" *(সূরা আন্-নিসা: ৪৮)* আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

"এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয়ই যারা আমার 'ইবাদত করতে অহংকার করবে, তারা অচিরেই অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা গা-ফির: ৬০)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ﴾

"বলো– হে কাফিররা! আমি তার 'ইবাদত করি না, যার 'ইবাদত তোমরা করো এবং তোমরাও তার 'ইবাদতকারী নও, যার 'ইবাদত আমি করি এবং আমি 'ইবাদতকারী নই তার, যার 'ইবাদত তোমরা করে আসছ।"

(সূরা আল-কাফিরূন: ১-৫)

জিজ্ঞাসা (০৩): ***বেনামাযী সন্তানদের ব্যাপারে পরিবারের কর্তার করণীয় কি?***

জবাব: পরিবারের কোনো সন্তান যদি বেনামাযী হয়, তবে কর্তার উপর আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে সালাতের ব্যাপারে বাধ্য করা। তিনি তাদেরকে সালাতের নির্দেশ দিবেন, বুঝাবেন, প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করবেন। কেননা নবী (ﷺ) বলেন,

وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِيْنَ.

"দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে।" *(আহমাদ- ২/১৮৭; আবূ দাউদ- কিতাবুস্ সালাত, ৪৯৫, ৪৯৬; সহীহুল জামে'- হা. ৫৮৬৮)*

এতে যদি কাজ না হয়, তবে (ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিযুক্ত) দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে তাকে সোপর্দ করবেন। যাতে করে তাকে সালাত আদায় করতে বাধ্য করা হয়। এক্ষেত্রে চুপ থাকা জায়িয হবে না। কেননা এতে অন্যায় কাজে সমর্থন হয়ে যায়। সালাত পরিত্যাগ করা কুফ্‌রী। সালাত আদায় না করলে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। বেনামাযী কাফির চিরকাল জাহান্নামী। তাই সে মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, জানাযা পড়া বা মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। (মহান আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি)

জিজ্ঞাসা (০৪): ***ইমামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে কি নিজ গৃহে থেকে জুমু'আর সালাত আদায় করা জায়িয হবে?***

জবাব: মসজিদে এসে মুসলমানদের জামা'আতে শামিল না হলে জুমু'আর সালাত আদায় করা জায়িয হবে না। কিন্তু মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে গেলে কাতার মিলিত হওয়ার শর্তে পার্শ্ববর্তী রাস্তায় সালাত আদায় করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু বাড়ীতে বা দোকানে সালাত আদায় করা কোনো মানুষের জন্য জায়িয বা বৈধ হবে না। কেননা জুমু'আ এবং জামা'আত অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের একস্থানে সমবেত হওয়া। তারা এক ঐক্যবদ্ধ জাতি একথা প্রমাণ করা। যাতে করে তাদের পরস্পরের মাঝে মমতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা আলেমদের নিকট থেকে দীন শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি এই অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা নিজ গৃহে থেকে রেডিওতে বা মাইক্রোফোনের আওয়াজ শুনে সালাত আদায় করবে, তবে মসজিদ নির্মাণ ও মুসলীদের উপস্থিত হওয়ার কোনো দরকার নেই। তাছাড়া এর মাধ্যমে জুমু'আহ্ ও জামা'আত পরিত্যাগ করার দরজা উম্মুক্ত করা হবে।

জিজ্ঞাসা (০৫): ***শুক্রবার দিবসের প্রথম ওয়াক্ত কখন থেকে শুরু হয়?***

জবাব: জুমু'আর দিবসের প্রহরসমূহ হচ্ছে পাঁচটি। নবী (ﷺ) বলেন:

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ».

"যে ব্যক্তি জুমু'আর দিবসে নাপাকী থেকে গোসল করার মতো গোসল করবে, অতঃপর প্রথম প্রহরে মসজিদে গমণ করবে, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি দুম্বা কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি মুরগী উৎসর্গ করল। যে ব্যক্তি পঞ্চম প্রহরে গমন করবে সে যেন একটি ডিম উৎসর্গ করল (মহান আল্লাহর পথে দান করল)। অতঃপর ইমাম বের হয়ে এলে ফেরেশ্‌তাগণ উপস্থিত হয়ে যিক্‌র (খুতবাহ্) শুনতে বসে পড়েন।" *(বুখারী- অধ্যায়: জুমু'আর সালাত, অনুচ্ছেদ: জুমু'আর ফযীলত; মুসলিম- অধ্যায়: জুমু'আর সালাত, অনুচ্ছেদ: জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা, হা. ৮৮১)*

এ হাদীসে সূর্য উদয় থেকে খুতবার জন্য ইমামের মিম্বরে আরোহণ পর্যন্ত সময়কে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলোর প্রতিটিই বর্তমান সময়ের এক ঘণ্টা বরাবর হতে পারে। এর কম বা বেশিও হতে পারে। কেননা দিন ছোট-বড় হয়। মোটকথা সূর্যোদয় থেকে ইমামের আগমন পর্যন্ত প্রহর হচ্ছে পাঁচটি। কেউ কেউ বলেন, এই প্রহরের গণনা ফজর উদিত হওয়া থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু এটা ভুল। কেননা সূর্যদয়ের পূর্বের সময় তো ফজর সালাতেরই সময়। মহান আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***জিনেরা কি গায়েব জানে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

জবাব: জিনেরা গায়েব জানে না। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আকাশ-জমিনের কোনো মাখলুকই গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾

"যখন আমি তাঁর (সোলায়মানের) মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিন্‌দেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।" ***(সূরা সাবা-: ১৪)***

সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্‌মে গায়েবের দাবী করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কাউকে ইল্‌মে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করবে, সেও কাফির। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"বলুন আসমান-যমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।" ***(সূরা আন্‌-নামল: ৬৫)***

যারা ভবিষ্যতের সংবাদ জানে বলে দাবী করে, তাদেরকে গণক বলা হয়। নবী (ﷺ) বলেছেন:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবূল হবে না।
(মুসলিম- অধ্যায়: কিতাবুস সালাম, হা. ১২৫/২২৩০)

গণকের কথা বিশ্বাস করলে কাফেরে পরিণত হবে। কারণ গণকের কথা বিশ্বাসের মাধ্যমে সে আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ﴾

"আসমান-যমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।" ***(সূরা আন্‌-নামল: ৬৫)***

জিজ্ঞাসা (০৭): ***দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য নবী (ﷺ)-এর প্রশংসা করার হুকুম কি?***

জবাব: দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের জন্য নবী (ﷺ)-এর প্রশংসা করা হারাম। এখানে জানা দরকার যে, নবী (ﷺ)-এর প্রশংসাকারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত।

১) বাড়াবাড়ি ব্যতীত নবী (ﷺ)-এর প্রশংসা করাতে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ- তাঁর চরিত্রে যে সমস্ত সৎ গুণাবলী রয়েছে, তা বর্ণনা করাতে কোনো দোষ নেই।

২) নবী (ﷺ)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা। তিনি এটা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لَا تُطْرُوْنِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ، وَرَسُوْلُهُ».

নাসারা সম্প্রদায় যেমনভাবে ঈসা ইবনু মারঈয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা সেভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমি একজন মহান আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে মহান আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বলো। ***(বুখারী- অধ্যায়: কিতাবু আহাদিসুল আম্বীয়া, হা. ৩৪৪৫)*** অতএব যে ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর প্রশংসা এভাবে করবে যে, তিনি আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় দাতা, বিপদ গ্রস্থের আহ্বানে সাড়া দানকারী, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, তিনি গায়েবের খবর জানেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসা করা হারাম; বরং কখনো ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী শির্‌ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুতরাং বেশি বাড়াবাড়ি করে নবী (ﷺ)-এর প্রশংসা করা ঠিক নয়।

রাসূল (ﷺ)-এর প্রশংসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে দুনিয়ার স্বার্থ অর্জন করা হারাম। রাসূল (ﷺ) যে সমস্ত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও প্রশংসিত বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন, তা বর্ণনা করা 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে জিনিস 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত তাকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা জায়িয নয়।

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের 'আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেসব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হয়েছে।" ***(সূরা হূদ: ১৫-১৬)***

মহান আল্লাহই সঠিক পথের সন্ধান দাতা।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***নবীগণ কেন তাঁদের উম্মতকে দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে সাবধান করেছেন? অথচ দাজ্জাল তো শেষ যামানাতেই বের হবে।***

জবাব: আদম সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে দাজ্জালের ফিত্‌না হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা। নবী (ﷺ) এই সংবাদ দিয়েছেন। এই জন্য নূহ (আলাইহিস সালাম) থেকে আরম্ভ করে মুহাম্মাদ (ﷺ) পর্যন্ত সকল নবীই তাঁদের সম্প্রদায়কে

দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। যাতে তারা সাবধান থাকতে পারে এবং দাজ্জালের বিষয়টি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলদের দায়িত্ব ছিল উম্মতকে সকল প্রকার অনিষ্ট হতে সাবধান করা। নবী (ﷺ) বলেছেন,

إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

“আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকাবস্থায় যদি দাজ্জাল বের হয়, তাহলে আমি একাই তার সাথে যুদ্ধ করব এবং তাকে প্রতিহত করব। আমি চলে গেলে যদি তার আগমণ ঘটে, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে তার ফিতনা থেকে রক্ষা করবে। আমার পরে মহান আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হেফাজত করবেন।” *(মুসলিম- অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান, হা. ১১০/২৯৩৭)*

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিত্না পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় ফিতনা, তাই বিশেষভাবে সালাতের মধ্যে নবী (ﷺ) দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি শেষ বৈঠকে এই দু‘আটিও পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিত্না হতে।” *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ২১৬৮)*

দাজ্জাল শব্দটি دجل হতে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা ইত্যাদি। দাজ্জাল যেহেতু সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী এবং সবচেয়ে বড় প্রতারক। তাই তাকে দাজ্জাল বলে নাম রাখা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***মৃত লাশকে যদি হিংস্র পশুরা খেয়ে ফেলে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয় তবেও কি কবরের আযাব হবে?***

জবাব: অবশ্যই হবে। কারণ আযাব হবে রূহের উপর। কেননা শরীর তো মাটির সাথে মিশে যাবে। তাছাড়া যেহেতু বিষয়টি গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ কথা বলা যাবে না যে, দেহের কোনো আযাবই হবে না। যদিও তা নষ্ট হয়ে গেছে বা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিষয়টি পরকালের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াতে দৃশ্যমান কোনো বস্তুর সাথে পরকালের গায়েবী বিষয়ের তুলনা চলে না। (এরপরও বলা হয় যে, দেহটি পুড়ে গেলে বা অন্য কোনো জন্তুতে ভক্ষণ করে ফেললে মানুষের জ্ঞানের পরিসর থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে গেলেও আল্লাহর জ্ঞানের পরিসরে তা বিদ্যমানই থাকে। সুতরাং আল্লাহর পক্ষে সেই বিলীন দেহের উপর আযাব প্রয়োগ বা শাস্তি প্রদান অসম্ভব নয়। যেমন- আমাদের কর্মের প্রভাবে একটি বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিলীন হয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি ফ্যান পূর্ণ মাত্রা দিয়ে ঘুরানো হলে পাখাগুলো দৃষ্টি শক্তির অগোচরে হয়ে যায় অথচ তার অস্তিত্ব বিদ্যমানই থাকে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

জিজ্ঞাসা (১০): ***এক শ্রেণীর লোক কবরের আযাব অস্বীকার করার পক্ষে দলিল পেশ করে যে, কবর খনন করলে দেখা যায় লাশ রয়ে গেছে, কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং কবর সংকীর্ণ অথবা প্রশস্তও হয়নি। আমরা কিভাবে তাদের উত্তর দিব?***

জবাব: আমরা বলব কবরের আযাব কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

“সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও।” *(সূরা গা-ফির: ৪৬)*

নবী (ﷺ) বলেছেন:

فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوْا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِيْ أَسْمَعُ مِنْهُ» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» قَالُوْا: نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

“তোমরা যদি দাফন না করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করতাম, যা আমি নিজে শ্রবণ করে থাকি। অর্থাৎ- তোমরা যেহেতু একে অপরকে দাফন করে থাকো, তাই আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করা বাদ দিলাম। কারণ তোমরা কবরের আযাব শুনতে পেলে দাফন করা বাদ দিবে। অতঃপর নবী (ﷺ) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ বললেন: আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর নবী (ﷺ) বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ বললেন: আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” *(মুসলিম- অধ্যায়: কিতাবুল জান্নাহ, হা. ৬৭/২৮৬৭)*

নবী (ﷺ) মু’মিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন:

يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ.

"তার কবরকে চোখের দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।" *(বুখারী- অধ্যায়: জানাযা; মুসনাদ আহমাদ- ৩০/৫০১)*

এমনি আরো অনেক দলিল রয়েছে, যা শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করা মোটেই জায়িয নয়; বরং তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নেয়া আবশ্যক। তাছাড়া কবরের আযাব হবে রূহের উপরে। শরীরের উপরে নয়। শরীরের উপরে হলে তা দেখা যেত, তখন বিষয়টি গায়েবের উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হত না। কিন্তু কবরের আযাবের বিষয়টি আলমে বরযখের তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার প্রকাশ্য বিষয়াদি দ্বারা এটাকে উপলব্ধি করা যাবে না। কবরের আযাব, শান্তি, কবরের প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণতা এসব বিষয় কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে। অন্য কেউ নয়। কখনো কখনো মানুষ স্বপ্নে দেখে যে, সে কোথাও যাচ্ছে, আকাশে উড়ছে, কাউকে প্রহার করছে কিংবা তাকে কেউ প্রহার করছে। আরো দেখে যে, সে এক সংকীর্ণময় স্থানে আছে অথবা প্রশস্ত কোনো স্থানে আনন্দময় জীবন যাপন করছে। অথচ ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশের লোকেরা কিছুই অনুভব করতে পারে না। সুতরাং আমাদের উচিত এই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করা, বিশ্বাস করা এবং সেগুলোর আনুগত্য করা।

জিজ্ঞাসা (১১): ***কাউকে শহীদ বলার হুকুম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।***

জবাব: কাউকে শহীদ বলা দু'ভাবে হতে পারে। যথা-

(১) নির্দিষ্ট কোনো কাজকে উল্লেখ করে শহীদ বলা। এভাবে বলা, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে নিহত হলো সে শহীদ, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে শহীদ, প্লেগ রোগে মারা গেলে শহীদ...। এভাবে বলা জায়িয আছে। কেননা এখানে আপনি নবী (ﷺ)-এর হাদীস অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করছেন।

২) নবী (ﷺ) নির্দিষ্ট করে যাকে শহীদ বলেছেন এবং সমস্ত মুসলমান যাকে শহীদ বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে শহীদ বলা জায়িয নেই। ইমাম বুখারী এভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যে, "একথা বলা যাবে না যে অমুক ব্যক্তি শহীদ"।

ইবনু হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ- ওহীর মাধ্যমে অবগত হওয়া ব্যতীত অকাট্যভাবে কারো জন্য শাহাদাতের ফায়সালা দেয়া যাবে না। তিনি সম্ভবত 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র একটি ভাষণের দিকে ইংগিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলে থাকো অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। খবরদার এভাবে বলো না। কারণ তার অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। তোমরা নবী (ﷺ)-এর মতো বলো যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল অথবা জীবন দিলো সে শহীদ।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হলে সে বিষয়ে ইল্‌ম থাকতে হবে। শহীদ হওয়ার শর্ত হলো মহান আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করা। আর এটি অন্তরের গোপন অবস্থা। তা জানার কোনো উপায় নেই। এজন্য নবী (ﷺ) বলেন:

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ».

"আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো, আর আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।" *(বুখারী- কিতাবুল জিহাদ, হা. ২৭৮৭)* নবী (ﷺ) আরো বলেন:

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ».

"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শরীরে জখম হবে, আর আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত স্থান হতে রক্ত ঝরতে থাকবে, রং হবে রক্তের, কিন্তু তার গন্ধ হবে মিসকের সুঘ্রাণের ন্যায়।"

(বুখারী- কিতাবুল জিহাদ, হা. ২৮০৩)

যারা জিহাদ করে নিহত হয়, তাদের বাহ্যিক অবস্থা ভালো। তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু তাদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করি না। তাদের প্রতি খারাপ ধারণাও করি না। তবে দুনিয়াতে তাদের উপর শহীদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকে তার পরিহিত কাপড়েই রক্ত সহকারে দাফন করা হবে এবং তার জানাযা পড়া হবেনা। আর যদি অন্যভাবে শহীদ হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল দেয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং জানাযার সালাত আদায় করা হবে। কাউকে 'শহীদ' হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ তাকে জান্নাতের সাক্ষ্য দেয়া। এটি আহলে সুন্নাহর মাযহাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলে সুন্নাতের লোকেরা নবী (ﷺ) যাকে শহীদ বলেছেন, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শহীদ বলেন না। ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মতে মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে যাকে শহীদ বলা হয়েছে, তাকে শহীদ বলা যাবে।

জিজ্ঞাসা (১২): ***প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলা সামনে বা পিছনে রাখার বিধান কি?***

জবাব: এ মাসআলায় বিদ্বানদের থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন-

একদল বিদ্বান বলেন, বন্ধ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কিবলা সামনে বা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা হারাম। তারা আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নবী (ﷺ) বলেন:

«إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: " فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟

"তোমরা পেশাব-পায়খানায় গেলে পায়খানার সময় বা প্রস্রাব করার সময় কিবলাকে সামনে রাখবে না এবং পিছনেও রাখবে না; বরং পূর্ব ও পশ্চিম দিক ফিরে বসবে।" *(বুখারী- অধ্যায়: ওযূ, অনুচ্ছেদ: পেশাব ও পায়খানায় কিবলা সামনে রাখবে না; মুসলিম- অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: হাজত পূরা করে পবিত্রতা অর্জন করা, হা. ৫৭/২৬৪)*

আবূ আইয়্যুব বলেন, আমরা শাম দেশে গিয়ে দেখি সেখানকার টয়লেট কাবার দিকে তৈরি করা আছে। আমরা তা ব্যবহার করার সময় বাঁকা হয়ে বসতাম অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম। এ বিষয়টি ছিল খোলা মাঠে। কিন্তু বন্ধ ঘরের মধ্যে যদি হয়, তবে কিবলা সামনে বা পিছনে রাখাতে কোনো দোষ নেই। ইবনু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন:

«ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ».

"আমি একদা হাফসার বাড়ীর ছাদে উঠলাম। দেখলাম নবী(ﷺ) শামের দিকে মুখ করে কাবার দিকে পিছন ফিরে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করছেন।" *(বুখারী- অধ্যায়: ওযূ, অনুচ্ছেদ: দু'টি ইঁটের উপর পায়খানা করা, হা. ৩১০২)*

বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, ঘেরা স্থানে হোক বা খোলা স্থানে হোক কোনো সময়ই কিবলা সম্মুখে বা পশ্চাতে রাখা যাবে না। তাদের দলিল হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত আবূ আইয়্যুব আনসারীর হাদীস। আর ইবনু 'উমারের হাদীস সম্পর্কে তাদের জবাব হচ্ছে–

প্রথমতঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার পূর্বের।

দ্বিতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞাই প্রাধান্য পাবে। কেননা নিষেধাজ্ঞা আসল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর আসল হচ্ছে জায়িয। তাই জায়েয থেকে স্থানান্তর হয়ে নাজায়িযের বিধানই গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয়তঃ আবূ আইয়্যুব বর্ণিত হাদীস নবী (ﷺ)-এর উক্তি। আর ইবনু 'উমারের হাদীস তাঁর কর্ম। রাসূল (ﷺ)-এর মৌখিক নির্দেশের হাদীস কর্মের হাদীসের সাথে সংঘর্ষশীল হতে পারে না। কেননা কর্মে বিশেষত্ব ও ভুলের সম্ভাবনা থাকে বা অন্য কোনো ওযরেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর নির্দেশ হলো ওহী।

এ মাসআলায় আমার মতে, **প্রাধান্যযোগ্য কথা হচ্ছে–** খোলা ময়দানে ক্বিবলা সামনে বা পিছনে রেখে শৌচকার্য করা হারাম। চার দেয়ালে ঘেরা স্থানে কিবলাকে পিছনে রাখা জায়িয হবে সামনে রাখা জায়েয নয়। কেননা কিবলার সম্মুখবর্তী হওয়ার হাদীস সংরক্ষিত। এখানে বিশেষত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পশ্চাতে রাখার নিষেধাজ্ঞাকে নবীজীর কর্ম দ্বারা বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সম্মুখে রাখার চাইতে পশ্চাতে রাখার বিষয়টি সহজ, এই কারণে (আল্লাহ ভালো জানেন) ঘেরার মধ্যে থাকলে বিষয়টিকে হালকা করা হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে কিবলাকে সম্মুখে বা পশ্চাতে না রাখা।

জিজ্ঞাসা (১৩): ***ওযূ চলছে এমন সময় পানি বন্ধ হয়ে গেল। পানি যখন ফিরে এল তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে গেছে। এখন ওযূ কি নতুন করে করতে হবে নাকি বাকী অঙ্গসমূহ ধৌত করলেই চলবে?***

জবাব: মাসআলাটির ভিত্তি হচ্ছে, ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা, ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত কি না? এতে বিদ্বানদের মধ্যে দু'টি মত পাওয়া যায়। যথা-

একটি মত হচ্ছে– মুওয়ালাত বা ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পরস্পর ধৌত করা অর্থাৎ- একটি না শুকাতে অপর অঙ্গ ধৌত করা ওযূ বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। একটি অঙ্গ ধৌত করার পর অপর অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে যদি বিচ্ছিন্নতা হয়ে যায়, তবে ওযূ বিশুদ্ধ হবে না। এটাই সঠিক মত। কেননা ওযূ পূর্ণাঙ্গ একটি 'ইবাদত। এর একটি অংশের সাথে অপর অংশের সম্পর্ক থাকা জরুরি। অঙ্গসমূহ পরস্পর ধৌত করার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, এক অঙ্গ ধোয়ার পর সাধারণভাবে এতটা সময় বিরতি গ্রহণ না করা যাতে পরের অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে তা শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই বিরতি গ্রহণ যদি পবিত্রতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- ওযূ শুরু করেছে এমন সময় লক্ষ্য করে কোনো এক অঙ্গে পেইন্ট বা এ জাতীয় কোনো বস্তু লেগে আছে, তখন তা অপসারণ করতে গিয়ে যদি দীর্ঘ সময়ের দরকার পড়ে এবং আগের অঙ্গ শুস্ক হয়ে যায়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, ওযূ চালিয়ে যাবে, নতুন করে আবার শুরু করতে হবে না। কেননা এই দীর্ঘতা তো পবিত্রতার কাজের সাথেই সম্পর্কিত। তাছাড়া এখানে তো ওযূর কাজে বিরতি গ্রহণ করা হয়নি।

কিন্তু পানির জন্য যদি বিরতি হয়, যেমনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, এ অবস্থায় পরস্পর ধৌত করার শর্ত ক্ষুন্ন হলো। অতএব তাকে পুনরায় নতুন করে ওযূ শুরু করতে হবে। আবার কেউ বলেন, নতুন করে ওযূ শুরু করার দরকার নেই। কেননা এখানে তো তার কোনো এখতিয়ার নেই। সে তো ওযূ পূর্ণ করারই অপেক্ষা করছে। তাই পানি আসলে ওযূর বাকী কাজ পূর্ণ করবে- যদিও ধৌতকৃত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

যে সমস্ত বিদ্বান পরস্পর ধৌত করা ওয়াজিব বলেন, তাদের কথা হচ্ছে– অঙ্গ শুস্ক হওয়া না হওয়ার সাথে পরস্পর ধৌত করার সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক পরিচিতির সাথে। সামাজিকভাবে যদি বলা হয় এখানে ওযূর মাঝে বিচ্ছিন্ন হলো বা বিরতি নেয়া হলো, তবে তাতে পরস্পরতা নষ্ট হবে। যেমন- পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যারা পানির অপেক্ষা করে তারা তো পানি নিয়ে আসার কাজে ব্যস্ত, সাধারণভাবে মানুষ এটাকে ওযূর প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মাঝে বিচ্ছিন্নতা বলে না। অতএব তারা পানি পাওয়ার পর ওযূর বাকী কাজ পূর্ণ করবে। আর এটাই উত্তম কথা। তবে যদি উক্ত বিরতি খুব বেশি দীর্ঘ হয়ে যায়, তবে নতুন করে শুরু করে নেয়াটাই ভালো। কেননা কাজটা খুবই সহজ।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***নখ পালিশ ব্যবহার করে ওযূ করার বিধান কি?***

জবাব: নখ পালিশ হচ্ছে এক প্রকার রং যা নারীরা তাদের নখে ব্যবহার করে থাকে। এটি গাঢ় হয়ে থাকে। নারী যদি সালাতী হয় তবে তার জন্য তা ব্যবহার করা জায়িয হবে না। কেননা এটা নখে থাকলে ওযূর পানি নখে পৌঁছবে না। আর কোনো বস্তুর কারণে যদি পানি পৌঁছতে বাধার সৃষ্টি হয়, তবে তা ওযূ ও গোসলকারীর জন্য ব্যবহার করা জায়িয নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা মুখমণ্ডল ও হাতদ্বয় ধৌত করো।" *(সূরা আল-মায়িদাহ: ৬)*

অতএব নারীর নখে যদি নখ পালিশ থাকে তবে তা তো পানি পৌঁছতে বাধা দিবে। সুতরাং তা থাকা অবস্থায় ওযূ বা গোসল করলে তো তার একটি অঙ্গ শুস্কই রয়ে গেল এবং ওযূ বা গোসলের একটি ফরয কাজ পরিত্যাগ করল।

কিন্তু নারী সালাতী না হলে, যেমন ঋতুবতী বা নেফাস বিশিষ্ট হলে, সে এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। তবে এ কাজ কাফির নারীদের বৈশিষ্টের অন্তর্গত। তাই সেটা ব্যবহার না করাতেই কল্যাণ। কেননা এতে তাদের সাথে সদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি শুনেছি, কোনো কোনো মানুষ নাকি ফাতাওয়া দিয়েছে যে, এটা হাত মোজা পরিধান করার ন্যায়। সুতরাং গৃহে অবস্থান করলে নারী তা একদিন একরাত, আর সফরে থাকলে তিনদিন তিন রাত ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এটি ভুল ফাতাওয়া ও অজ্ঞতা। মানুষের শরীর আচ্ছাদিত করে এমন প্রত্যেক বস্তুকেই মোজার সাথে তুলনা করা উচিত নয়। ইসলামী শরীয়তে যে মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র পায়ের মোজার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা প্রয়োজনের সময়। কেননা ঠাণ্ডার কারণে বা ময়লা-আবর্জনা থেকে সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য পায়ে মোজা পরিধাণ করার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য শরীয়ত মানুষের প্রতি সহজ করে এর উপর মাসেহ করা বৈধ করেছে।

অনেক সময় ওরা নখ পালিশ ব্যবহারকে পাগড়ীর উপর মাসেহ করার সাথে তুলনা করে। এটা আরেক অজ্ঞতা। কেননা পাগড়ীর স্থান হচ্ছে মাথা। আর মাথার ক্ষেত্রে আগে থেকেই সহজ করা রয়েছে। তা ধৌত করতে হবে না। সেখানে মাসেহ করতে হবে। কিন্তু হাত এর বিপরীত। হাতের ফরয হচ্ছে তা ধৌত করা। এ কারণে নবী (ﷺ) নারীদের হাত মোজাতে মাসেহ করা বৈধ করেননি। অথচ তা হাত ঢেকে রাখে। অতএব পানি পৌঁছতে বাধাদানকারী যে কোনো পর্দা হলেই তাকে পাগড়ী বা মোজার সাথে তুলনা করা জায়েয নয়। প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। এমন কোনো ফাতাওয়া না দেয়া যার জন্য আল্লাহর সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা এটা আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত, এখানে অনুমান ও ধারণা করে কোনো কিছু বলার অবকাশ নেই। (আল্লাহ তাওফীক্ব দাতা ও সঠিক পথ প্রদর্শক)

জিজ্ঞাসা (১৫): ***'আক্বীদাহ্ ও অন্যান্য দ্বীনি বিষয়ের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতিগুলো কি কি?***

জবাব: 'আক্বীদাহ্ ও দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হলো মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়িয়ে ধরা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾

"হে নবী! আপনি বলুন যে, তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।" *(সূরা আ-লি-'ইমরান: ৩১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

"যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করল সে স্বয়ং আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে, আমি তাদের জন্য আপনাকে সংরক্ষণকারী হিসাবে প্রেরণ করিনি।" *(সূরা আন্-নিসা: ৮০)* আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

"এবং আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।" *(সূরা আল-হাশর: ৭)*

যদিও আয়াতটি গণীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তবে শরীয়তের অন্যান্য মাসায়েলের ক্ষেত্রেও উত্তমভাবে প্রযোজ্য হবে। নবী (ﷺ) জুমু'আর সালাতের খুৎবায় বলতেন,

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

"অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নির্দেশনা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে দ্বীনের ভিতরে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা। প্রতিটি বিদ্‌আতই গোমরাহী। আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।" *(মুসলিম- অধ্যায়: সালাতুল জুমু'আহ, হা. ৪৩/৮৬৭)* রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং সেটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। আর তোমরা দ্বীনের বিষয়ে নতুন আবিস্কৃত বিষয় হতে সাবধান থাকবে। কারণ প্রতিটি নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।" *(আবূ দাউদ- অধ্যায়: কিতাবুস্ সুন্নাহ, হা. ৪৬০৭, সহীহ)* এ সম্পর্কে আরো অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ হলো আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পথকে আঁকড়িয়ে ধরা। তারা সদাসর্বদা দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করেন, এর ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করেন না। আল্লাহ বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দ্বীনকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে আর যা আমি ওহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রা-হীম, মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে, এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।"

(সূরা আশ-শূরা-: ১৩)

তাদের মাঝে কখনো মতবিরোধ হয়ে থাকলে তা হয়েছে কেবল এমন ক্ষেত্রে, যাতে ইজতেহাদ (কুরআন ও সুন্নায় দ্বীনের কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ না পাওয়া গেলে মুসলিম উম্মার বিজ্ঞ আলেমগণ কুরআন সুন্নাহকে সামনে রেখে গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তাকে ইজতেহাদ বলে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করা বৈধ আছে। আর যে আলেম ইজতেহাদ করার যোগ্য, তাঁকে মুজতাহেদ বলা হয়) করা বৈধ আছে। এই ধরণের মতবিরোধ অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করে না। ইজতেহাদী বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ হওয়া সত্তেও আপনি তাদের মাঝে একতা এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাবেন।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***পুরুষ ও নারীর খাতনা করার বিধান কি?***

জবাব: খাতনার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। নিকটবর্তী মত হচ্ছে, পুরুষের খাতনা করা ওয়াজিব আর নারীর জন্য সুন্নাত। এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, পুরুষের খাতনার মাঝে একটি 'ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে নামাযের পবিত্রতা। যদি খাতনা না করা হয়, তবে পেশাব বের হলে তার কিছু অংশ লিঙ্গের ঢাকনা চামড়ার ভিতরে জমা হয়ে থাকে, যা জ্বলনের কারণ হয় বা সেখানে ইন্‌ফেকশন((Infection) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সর্বনিম্ন অসুবিধা হচ্ছে, যখনই সে নড়াচড়া করবে, তখনই পেশাবের বিন্দু বের হবে এবং তার শরীর ও কাপড় নাপাক করে দিবে। আর নারীর খাতনা করার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা হচ্ছে, তার যৌন উত্তেজনা হ্রাস করা। আর এটা হচ্ছে তার একটি পূর্ণতা। এখানে খারাপ অতিরিক্ত কোনো বিষয়কে বিদূরীত করা হচ্ছে না। যেমন- পুরুষের বেলায় হয়ে থাকে। বিদ্বানগণ খাতনার ক্ষেত্রে শর্ত করেছেন, খাতনা করলে যদি অসুস্থতা বা প্রাণনাশের আশংকা থাকে, তবে সে অবস্থায় খাতনা করা ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব বিষয়সমূহ অপারগতা, ধ্বংসের আশংকা ও ক্ষতির কারণে রহিত হয়ে যায়।

পুরুষের খাতনা ওয়াজিব হওয়ার দলিল:

প্রথমতঃ এ মর্মে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে নবী (ﷺ) খাতনা করার আদেশ করেছেন।

(মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪১৫)

আর নবীজীর নির্দেশ মানেই তা পালন করা ওয়াজিব।

দ্বিতয়তঃ খাতনা হচ্ছে মুসলিম ও খ্রিষ্টান বা হিন্দুদের মাঝে পার্থক্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট। এমনকি মুসলমানগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে খাতনার মাধ্যমে নিজেদের নিহত ব্যক্তিদের খুঁজতেন। আর যা বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য তা হচ্ছে ওয়াজিব। কেননা মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য থাকা ওয়াজিব। এই কারণেই নবী (ﷺ) কাফিরদের সাথে সাদৃশাবলম্বন নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি কোনো জাতির সদৃশ অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" *(আবূ দাউদ- অধ্যায়: পোষাক, হা. ৩৫১২; মুসনাদে আহমাদ- হা. ৪৮৬৯, ৫৪০৯)*

তৃতীয়তঃ খাতনা হচ্ছে শরীর থেকে একটি জিনিস কর্তন করা। বিনা কারণে শরীরের কোনো অংশ কর্তন করা হারাম। আর ওয়াজিব কারণ ছাড়া হারামকে হালাল করা বৈধ নয়। অতএব খাতনা করা ওয়াজিব।

চতুর্থতঃ খাতনা করলে অভিভাবকের পক্ষ থেকে ইয়াতীমের উপর ও তার সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কেননা এতে খাতনাকারীকে পারিশ্রমিক দেয়া আবশ্যক। বিষয়টি ওয়াজিব না হলে তার শরীরে ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা জায়িয হত না।

হাদীসের বাণী ও উল্লেখিত যুক্তি দ্বারা আমরা প্রমাণ করলাম যে, পুরুষের খাতনা করা ওয়াজিব। কিন্তু নারীর খাতনা ওয়াজিব বলার ক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সঠিক মত হচ্ছে, পুরুষের খাতনা করা ওয়াজিব, নারীর নয়। একটি য'ঈফ হাদীস রয়েছে। বলা হয়েছে,

اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

"খাতনা পুরুষের জন্য সুন্নাত ও নারীর জন্য সম্মান।"

(আহমাদ- ৫/৭৫; দ্র. য'ঈফ জামে' সগীর- আলবানী, হা. ২৯৩৮)

হাদীসটি বিশুদ্ধ হলে সকল মতভেদের সমাধান হয়ে যেত।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***কৃত্রিম দাঁত থাকলে কুলি করার সময় কি সেটা খুলে রাখা ওয়াজিব?***

জবাব: কারো মুখে যদি দাঁত বাধানো থাকে, তবে ওযূর সময় সেটা খুলে রাখা আবশ্যক নয়। সেটা হাতের আংটি বা ঘড়ি ব্যবহার করার মতো। ওযূর সময় আংটি খোলা আবশ্যক নয়; বরং উত্তম হচ্ছে সেটা নাড়িয়ে দেয়া, কিন্তু এই নাড়ানোও ওয়াজিব নয়। কেননা নবী (ﷺ) আংটি পরিধান করতেন কিন্তু এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি ওযূর সময় সেটা খুলে রাখতেন। অথচ মুখের মধ্যে বাঁধানো দাঁতের তুলনায় আংটিই পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে বাধার কারণ হতে পারে। তাছাড়া কোনো কোনো মানুষের দাঁত অনেক কষ্টে বাধাই করতে হয়- যা যখন তখন খোলা ও লাগানো সম্ভব হয় না।

জিজ্ঞাসা (১৮): ***কান মাসেহ করার জন্য কি নতুন করে পানি নিতে হবে?***

জবাব: কান মাসেহ করার জন্য হাতে নতুন পানি নেয়া আবশ্যক নয়। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুস্তাহাবও নয়। কেননা নবী (ﷺ) থেকে ওযূর পদ্ধতি বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে কেউ এমন কথা উল্লেখ করেননি যে, তিনি কান মাসেহ করার জন্য নতুন করে পানি নিতেন। অতএব মাথা মাসেহ করার পর হাতের অবশিষ্ট ভিজা দিয়েই কান মাসেহ করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (১৯): ***ওযূতে ধারাবাহিকতার অর্থ কি? ওযূতে মুওয়ালাত বা পরস্পর করার অর্থ কি? এ দু'টি কথার বিধান কি?***

জবাব: ওযূর মধ্যে ধারাবাহিকতার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ যে ধারাবাহিকতার সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন সেভাবে ওযূ করা। আল্লাহ প্রথমে মুখমণ্ডল ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তারপর দু'হাত, তারপর মাথা মাসেহ করা এবং শেষে পা ধৌত করা। কোনো মানুষ যদি উল্টাপাল্টা করে যেমন প্রথমে হাত তারপর পা তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করে তারপর মাথা মাসেহ করে তবে তার ওযূ হবে না। এই কারণে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব নয় সুন্নাত। অতএব আল্লাহ তা'আলা যে সিরিয়ালে ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন, তাকেই ধারাবাহিকতা বলে যা বজায় রাখা ওযূর অন্যতম ওয়াজিব। নবী (ﷺ) হজ্জে গিয়ে সাঈ' করতে গিয়ে প্রথমে সাফা পর্বতে আরোহণ করে পাঠ করেন,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

"'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত' *(সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৫৮)* এবং তিনি (ﷺ) বলেন,

«أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ».

'আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুরু করেছেন সেভাবে শুরু করছি'।" *(মুসলিম- অধ্যায়: হজ্জ, হা. ১৪৭/১২১৮)*

এখানে তিনি বর্ণনা করে দিলেন, কেন তিনি মাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে প্রথমে সাফা পর্বতে আরোহন করলেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন সেখান থেকেই প্রথমে শুরু করা।

আর মুওয়ালাত বা ওযূর কাজ পরস্পর করার অর্থ হচ্ছে, ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বিরতি গ্রহণের মাধ্যমে পৃথক না করা। এর উদাহরণ হচ্ছে, মুখমণ্ডল ধৌত করার পর পরই হাত না ধুয়ে দেরী করা। এ অবস্থায় তার পরস্পরতা নষ্ট হয়ে গেল, তাই তাকে নতুন করে ওযূ আরম্ভ করতে হবে। কেননা নবী (ﷺ) দেখলেন জনৈক ব্যক্তি ওযূ করেছে কিন্তু পায়ে তার নখ বরাবর একটি স্থান রয়েছে। তিনি তাকে বললেন,

«اَرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ».

"তুমি ফিরে গিয়ে সুন্দরভাবে ওযূ করে আসো।" *(মুসলিম- অধ্যায়: পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ: পবিত্রতার অঙ্গের সমস্ত অংশ শামিল করে ওযূ করা, হা. ৩১/২৪৩)*

আবূ দাউদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি তাকে পুনরায় নতুন করে ওযূ করার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, ওযূতে পরস্পরা রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা ওযূ একটি 'ইবাদত। আর একটি 'ইবাদতের বিভিন্ন অংশের মাঝে বিচ্ছিন্ন করলে পরস্পরের উপর ভিত্তি করা চলে না।

জিজ্ঞাসা (২০): ***কখন মেসওয়াক ব্যবহার করার গুরুত্ব বেশি? খুতবাহ্ চলাবস্থায় নামাযের অপেক্ষাকারীর মেসওয়াক করার বিধান কি?***

জবাব: নিম্ন লিখিত সময় মেসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ– নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে, গৃহে প্রবেশ করে, ওযূতে কুলি করার সময়, সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার সময়। সালাতের অপেক্ষাকারীর মেসওয়াক করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু খুতবাহ্ চলাবস্থায় মেসওয়াক করবে না। কেননা এটা তাকে খুতবাহ্ শোনা থেকে ব্যস্ত করবে। কিন্তু তন্দ্রা কাটানোর প্রয়োজনে মেসওয়াক ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি

ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম মসজিদ

জিব্রাল্টারের ঐতিহাসিক দাওয়াহ সেন্টার

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

ইউরোপের দক্ষিণতম প্রান্তে, জিব্রাল্টার প্রণালীর তীরে অবস্থিত ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম মসজিদ (Ibrahim al-Ibrahim Mosque) আধুনিক ইউরোপে ইসলামী স্থাপত্য, ধর্মীয় পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এটি কেবল একটি 'ইবাদতগাহ নয়; বরং ইউরোপে মুসলিম উপস্থিতির ধারাবাহিকতা, ইসলামী শিক্ষা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। সমুদ্র ও মহাদেশের মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা এই মসজিদ যেন ইতিহাস, বিশ্বাস ও সভ্যতার এক নীরব সাক্ষ্য বহন করে।

১৯৯৭ সালে উদ্বোধন হওয়া এই ইসলামিক কমপ্লেক্সটি সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয আল-সাউদের অর্থায়নে নির্মিত হয়। বর্তমানে এটি জিব্রাল্টারের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ইউরোপের উল্লেখযোগ্য ইসলামিক স্থাপনাগুলোর অন্যতম।

জিব্রাল্টারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: জিব্রাল্টার পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূ-কৌশলগত অঞ্চল। ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকেই এটি ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ, বাণিজ্য এবং সামরিক অভিযানের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ফিনিশীয়, রোমান, ভিসিগথ, মুসলিম, স্প্যানিশ এবং ব্রিটিশ শাসনের সাক্ষী হয়েছে এই অঞ্চল।

জিব্রাল্টারের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক শুরু হয় ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে। সে বছর উমাইয়া খেলাফতের অধীনস্থ বারবার সেনাপতি তারিক ইবন জিয়াদ এই উপকূলে অবতরণ করে আইবেরীয় উপদ্বীপে তাঁর ঐতিহাসিক অভিযান শুরু করেন। তাঁর নামানুসারে পাহাড়টির নাম হয় "জাবাল-ই তারিক", যা ধীরে ধীরে উচ্চারণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে "জিব্রাল্টার" নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই অভিযানের মধ্য দিয়েই আন্দালুসে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে, যা প্রায় আট শতাব্দী ধরে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশে অসামান্য অবদান রাখে। যদিও পরবর্তীকালে জিব্রাল্টার খ্রিষ্টান শাসনের অধীনে চলে যায়, তবুও এর নাম, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে ইসলামের গভীর ছাপ আজও অম্লান।

আধুনিক জিব্রাল্টারে মুসলিম সমাজের বিকাশ: বর্তমান জিব্রাল্টারের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মরক্কো থেকে আগত অভিবাসীদের উত্তরসূরি। বিশেষ করে ১৯৬৯ সালে স্পেন সীমান্ত বন্ধ করে দিলে জিব্রাল্টারে কর্মরত বহু মরক্কান শ্রমিক সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জামে মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে সৌদি আরব জিব্রাল্টারের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামিক কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিতেই গড়ে ওঠে ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম মসজিদ।

সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মাণ: ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সৌদি আরব সরকারের অর্থায়নে মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় তৎকালীন বাদশাহ ফাহাদের উদ্যোগে এবং প্রায় দুই বছরের নির্মাণ কাজ শেষে ১৯৯৭ সালের ৮ আগস্ট এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

প্রায় পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি শুধু একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ ছিল না; বরং এটি ছিল জিব্রাল্টারের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক ইসলামিক সহযোগিতা ও প্রবাসী মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অবকাঠামো উন্নয়নে সৌদি আরবের যে নীতি বিশ শতকের শেষভাগে দৃশ্যমান হয়, এই মসজিদ তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়: ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম মসজিদের অবস্থানই একে অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। এটি নির্মিত হয়েছে ইউরোপা পয়েন্টে–জিব্রাল্টারের দক্ষিণতম প্রান্তে। পরিষ্কার আবহাওয়ায় এখান থেকে আফ্রিকার মরক্কো উপকূল স্পষ্ট দেখা যায়। ফলে এই মসজিদ ভৌগোলিকভাবে যেমন ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থলের প্রতীক, তেমনি ঐতিহাসিকভাবেও আন্দালুসীয় ইসলামের স্মৃতিকে ধারণ করে।

স্থাপত্যশৈলীতে আরব, আন্দালুসীয় এবং আধুনিক ইসলামী নকশার সুষম সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সাদা মার্বেলের বহিরাবরণ, সুউচ্চ মিনার, সুবিশাল কেন্দ্রীয় গম্বুজ, খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, জ্যামিতিক অলংকরণ এবং সমমিতিক পরিকল্পনা মসজিদটিকে একাধারে গাম্ভীর্য ও নান্দনিকতার অনন্য উদাহরণে পরিণত করেছে। অলংকরণের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের পরিবর্তে পরিচ্ছন্নতা ও শৈল্পিক সংযমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা সমকালীন ইসলামি স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

অভ্যন্তরীণ নকশাও সমানভাবে আকর্ষণীয়। প্রশস্ত সলাতের স্থান, উচ্চ ছাদ, বিশাল গম্বুজ, মার্বেল নির্মিত মেঝে, দৃষ্টিনন্দন মিম্বার, কারুকার্যময় মিনবার, বৃহৎ ঝাড়বাতি এবং উন্নত শব্দপ্রতিধ্বনি ব্যবস্থা সমবেত ‘ইবাদতের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি এমনভাবে প্রাকৃতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে দিনের অধিকাংশ সময় কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন পড়ে না। স্থাপত্যের এই পরিকল্পনা নান্দনিকতার পাশাপাশি পরিবেশগত দক্ষতারও পরিচয় বহন করে।

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র: ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম মসজিদ কেবল সলাত আদায়ের স্থান নয়; এটি একটি সমন্বিত ইসলামিক কমপ্লেক্স। এখানে রয়েছে সমৃদ্ধ ইসলামিক গ্রন্থাগার, কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র, আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, একাধিক শ্রেণিকক্ষ, সম্মেলন কক্ষ, প্রশাসনিক ভবন, ইমামের বাসভবন, ওযূখানা, রান্নাঘর এবং বিভিন্ন কমিউনিটি সুবিধা। ফলে এটি ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের একটি বহুমাত্রিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব: বর্তমানে এই মসজিদ জিব্রাল্টারের মুসলমানদের প্রধান জামে মসজিদ। জুমু‘আহ্ ও ঈদের জামা‘আত, রমাযানের বিশেষ কর্মসূচি, কুরআন শিক্ষা, শিশু-কিশোরদের ইসলামী শিক্ষা, ইসলাম গ্রহণকারীদের সহায়তা এবং বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম এখান থেকেই পরিচালিত হয়।

একই সঙ্গে এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। জিব্রাল্টারের বহুসাংস্কৃতিক সমাজে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই কেন্দ্র ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

জিব্রাল্টারের অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা: ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম আজ জিব্রাল্টারের অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা। প্রতি বছর হাজার হাজার দেশি-বিদেশি পর্যটক এর স্থাপত্য, মনোরম অবস্থান এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করতে এখানে আসেন। ইউরোপের দক্ষিণতম বৃহৎ ইসলামিক কেন্দ্রগুলোর একটি হিসেবে এটি বিশেষভাবে পরিচিত।

অনেক অমুসলিম দর্শনার্থীর জন্যও মসজিদটি ইসলামি সংস্কৃতি, ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্পর্কে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। এ দিক থেকে এটি ধর্মীয় পর্যটন ও সাংস্কৃতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সৌদি আরবের দাওয়াহ কার্যক্রমে ভূমিকা: বিশ শতকের শেষভাগে সৌদি আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, ইসলামিক কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগার নির্মাণে ব্যাপক অর্থায়ন করে। এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই ধর্মীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা, ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং কমিউনিটি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম মসজিদ সেই আন্তর্জাতিক উদ্যোগের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

তবে এ ধরনের উদ্যোগের মূল্যায়ন একমাত্রিক নয়। বিভিন্ন গবেষক মনে করেন, এসব প্রকল্প প্রবাসী মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার, মতাদর্শ এবং ভূরাজনৈতিক কৌশলের আলোচনায়ও এ ধরনের অর্থায়নকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে বিষয়টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সরকারি নথি, একাডেমিক গবেষণা এবং স্বাধীন বিশ্লেষণ- সব ধরনের নির্ভরযোগ্য উৎস বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপসংহার: ইবরহীম আল-ইবরাহীম মসজিদ একটি স্থাপত্য নিদর্শনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এটি জিব্রাল্টারের দীর্ঘ ইসলামী ঐতিহ্য, আধুনিক ইউরোপে মুসলিম পরিচয়ের বিকাশ, আন্তধর্মীয় সহাবস্থান এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক সহযোগিতার একটি শক্তিশালী প্রতীক। এর ভৌগোলিক অবস্থান, শৈল্পিক স্থাপত্য, বহুমাত্রিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং সামাজিক ভূমিকা একে ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

একই সঙ্গে এই মসজিদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মীয় স্থাপনা কেবল ‘ইবাদতের স্থান নয়; এগুলো ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সামাজিক সংহতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও গুরুত্বপূর্ণ বাহক হতে পারে। জিব্রাল্টারের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে ইব্‌রাহীম আল-ইব্‌রাহীম মসজিদ আজও ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যকার ইতিহাস, বিশ্বাস এবং সভ্যতার এক জীবন্ত সেতুবন্ধনের প্রতীক হয়ে রয়েছে।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. **25.00**

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত